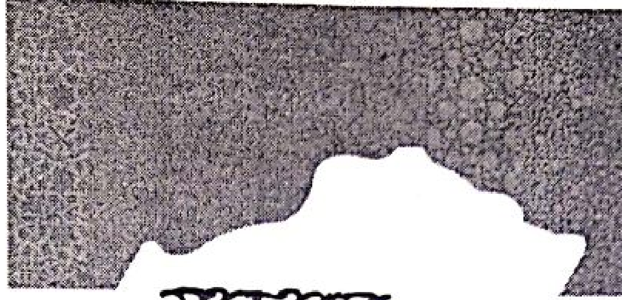
সন্দেহের নিরসন-১

মোঃ গিয়াস উদ্দীন

সন্দেহের নিরসন-১



সন্দেহের
নিরসন-১

মোঃ গিয়াস উদ্দীন

মো. গিয়াস উদ্দীন

সন্দেহের নিরসন-১

মো. গিয়াস উদ্দীন

প্রকাশক

মাওলানা নোমান আহমদ

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল, ২০১৮

শাবান, ১৪৩৯

বৈশাখ, ১৪২৫

পরিমার্জিত সংস্করন

জুলাই, ২০১৮

জিলকদ, ১৪৩৯

শ্রাবণ, ১৪২৫

মূল্যঃ ১০০ টাকা

Sondeher Niroshon By Md. Gias Uddin, Published by Mawlana Numan Ahmed

সূচীপত্র

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া, যিনি আমাদেরকে হক্কানী ওলী আউলিয়াগণের প্রতি মন্দ ধারনা পোষন করা থেকে মুক্ত রেখেছেন। সালাত ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যার নূর থেকে আমরা ঈমানের নূর প্রাপ্ত হয়েছি।

উল্লেখ্য যে, মানুষের মনে ওয়াসওয়াসাহ দেয়া শয়তান ও তার অনুসারীদের কাজ। আমরা লক্ষ করি আহলে হাদীস, সালাফী এবং কিছু সংখ্যক নামধারী বক্তা ও লেখক লাগামহীনভাবে নবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহদের সম্পর্কে কটুক্তি ও আমলে মুতাওয়ারিসার বিরোধীতার মাধ্যমে সরলমনা মানুষদেরকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন।

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে তাদের এ বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রচার ও প্রসার লাভ করায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কৌতুহলবশত: তা পাঠ করে দ্বিধান্বিত হচ্ছেন।

অপরদিকে হকপন্থী উলামায়ে কিরাম কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে তাদের এ অপচেষ্টাকে খণ্ডন কর যাচ্ছেন।

আমরা এ ব্যাপারে বিশেষ কোন বিষয়ের উপর বই না লিখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। আমরা যথাসম্ভব হক্কানী আলিম উলামাদের মতামত ও দলীল প্রমানের মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রথম মুদ্রনের পরই পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়। পাঠকদের অনুরোধে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

আশা করি, পাঠকবৃন্দ পুস্তকটি পাঠ করলে তাদের মনে অংকুরিত দ্বিধা ও সন্দেহ কেটে যাবে। তারা যদি বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভে সহায়তা পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه– وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه–

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শারিরীক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার পরিণতি

আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন বৈশিষ্ট্য মানে না। তারা বলে থাকে, তিনি তাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ। পার্থক্য হলো তাঁর কাছে কেবল ওহী আসে। ভ্রান্ত লা-মাযহাবীদের সাথে সুর মিলিয়ে অনেক দেওবন্দি আলিমও অনুরূপ বক্তব্য দিয়ে থাকেন। অথচ তাদের আকাবিরগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনেক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ঘটনাবলী আলোচনা করা এবং এর স্বপক্ষে ফতোয়া বলার কারণে লা-মাযহাবীরা তাদের উপর কুফরী, শিরকী ও বেদআতী হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেছে। পক্ষান্তরে নিজের আকাবীরগণকে অভিযোগমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের অনুসারী আলিমগণ সে সকল ফতোয়ার যে উত্তর দিয়েছেন তা পাঠ করলে বৈশিষ্ট্য অস্বীকারকারী অধিকাংশ আলিমকে লা-মাযহাবীদের অনুসারী ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। প্রমাণ স্বরূপ আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি। তাবলীগি নেসাব প্রণেতা শায়খুল হাদীস জাকারিয়া সাহেব তার লিখিত 'হেকায়তে সাহাবা' কিতাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বতের আলোচনার অধ্যায়ে দুইজন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ও হযরত মালিক বিন সানান (রা.) কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রক্ত মোবারক পান করার দুইটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনাগুলো উল্লেখ করার কারণে তাবিশ মাহদী নামক একজন বিশিষ্ট লা-মাযহাবী আলিম শায়খুল হাদীস জাকারিয়া সাহেবকে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মিথ্যা আরোপকারী সাব্যস্ত করেছেন। যার জবাব প্রদান করেছেন জাকারিয়া সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা ইউসূফ লুদিয়ানভী সাহেব। ইউসূফ লুদিয়ানভী সাহেবের কিতাব থেকে তাবিশ মাহদির অভিযোগ ও লুদিয়ানভী সাহেবের জবাব নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১ম অভিযোগঃ রক্ত আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, চাই তা যে কারো হোক। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- "তোমাদের উপর মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত হারাম করে দেয়া হয়েছে"। (সূরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

সুতরাং কুরআনের আলোকে রক্ত সদা সর্বদা সকলের জন্য হারাম। এখন কেউ যদি এটাকে নিজেস্ব মতে জায়িয বলে থাকে সে যেন আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করল। (আপকে মাসাঈল, খণ্ড:৭ পৃষ্ঠা:২৯০)

২য় অভিযোগ : আমার প্রবল ধারণা শায়খুল হাদীসের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার ঠিকানা দুযখে তালাশ করে'। নিঃসন্দেহে শায়খুল হাদীস সাহেব সনদহীন এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অপবাদ আরোপ করেছেন। (আপকে মাসাঈল, খণ্ড: ৭ পৃষ্ঠা: ২৯১)

উল্লেখ্য, দেওবন্দীদের মুখপাত্র ইউসূফ লুদিয়ানভী সাহেব তার লিখিত 'আপকে মাসায়েল আওর ইন কা হল' কিতাবে ৩০৬-৩১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা করে জবাব প্রদানের মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রক্ত ও পেশাব পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন।

দেওবন্দিদের মুনাজিরে আজম আমীন সফদর উকাড়বী কাছিম নানুতবী সাহেবের 'হায়াতুন্নবী' প্রসঙ্গে একটি বক্তব্যের উপর লা মাযহাবীদের অভিযোগের জবাবে লিখেন-
মোটকথা, হযরত নানুতবী (র.) বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা নবীগনকে দুনিয়াতে যে শরীর দান করেছেন ইহাও জান্নাতি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, বর্ণিত আছে, জান্নাতে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না। বরং খুশবুদার ঘাম বের হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘাম দুনিয়ার জগতেও খুশবুদার ছিল। যা হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত। জান্নাতী বস্তুগুলো যেভাবে পচঁবেও না গলবেও না, ঠিক তদ্রুপ অবস্থা নবীগণের শরীরেরও। কেননা, এতে বেহেস্তী মাটির প্রভাব রয়েছে। (খুতবাতে সফদর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩২)
দেওবন্দিদের আরো একজন বিশিষ্ট আলিম শেখ আবরারুল হক সাহেবের খলিফা হেকিম আখতার সাহেব একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম হলো 'মওদুদী: আকাবীরে উম্মত কি নযর মে' উক্ত কিতাবে মওদুদী সাহেবের উক্তি ''রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন'' এর জবাবে লিখেছেন-

অনুবাদঃ মওদুদী সাহেব বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় দুর্বলতার উর্দ্ধে নন। অথচ আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম হলো নবীগণকে সাধারণ মানুষ থেকে উন্নত ধাচে তৈরী করা হয়েছে। তাদের শারীরিক সক্ষমতা ও শক্তি সাধারণ মানুষ থেকে উর্দ্ধে; বরং একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চল্লিশ জন জান্নাতির সমপরিমাণ শক্তি দান করা হয়েছে। আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন জান্নাতিকে দুনিয়ার একশজনের চেয়ে বেশী শক্তি দান করা হবে। কাযী আয়ায (র.) 'শিফা' গ্রন্থে এবং ইমাম সুয়ূতী (র.) 'খাসাইসে কুবরা' গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি কি জান না আমাদের দেহ জান্নাতবাসীদের দেহের মতো। (পৃষ্ঠাঃ ৩৩)

লা-মাযহাবী ওয়াহাবীদের এ ধরনের ফতোয়া প্রদান করার কারণ হলো তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মতই একজন মানুষ মনে করে থাকেন এবং তাঁর দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে অস্বীকার করে থাকেন। কিছু সংখ্যক দেওবন্দি তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলার কারণে তাদের আকাবিরীণগণ মুশরিক, বিদাতী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মিথ্যা আরোপকারী ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাই দেওবন্দিরা যেন এ ধরনের বক্তৃতা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

পরিশেষে আমরা আল্লামা ইউসূফ বিননূরীর 'মা'আরিফুস সুনান' কিতাব থেকে এ প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য তুলে ধরছি-

ولا ريب ان ابدان الانبياء –ثم سيد الانبياء نبتت علي اجساد اهل الجنة – كما ثبت في الحديث ولا شك ان ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها–(معارف السنن, جلد ثالث, ص324)

বিননূরী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবীগণের শরীর মুবারক বেহেস্তীদের অনুরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর বেহেস্তের একটি বালু কণা সমস্ত পৃথিবীর চাইতে উত্তম। সুতরাং এ শরীর মুবারকের সাথে নিজেদেরকে তুলনা করা শয়তানের বেয়াদবী থেকে আরো জঘন্যতম।

আহমদ রেযা খান সাহেব কি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন?

এটা সবর্জন প্রসিদ্ধ যে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বৃটিশ শাসিত ভারতভূমিকে 'দারুল হারব' বা অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্র বলে ফতওয়া দিয়েছেন। সে জন্য তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইমামে তারীকত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলবী (র.) বৃটিশ সমর্থিত শিখ সেনাদের সাথে জিহাদ করে শহীদ হন।

পক্ষান্তরে আলা হযরত আহমদ রেযা খান বৃটিশ শাসিত ভারতভূমিকে 'দারুল ইসলাম' বলে ফতওয়া দিয়েছেন। তার লিখিত আহকামে শরীয়ত থেকে সে ফতওয়া নিচে দেওয়া হল:

مسئلہ ۱۵ کیا فرماتے ہیں اعلحضرت مجدد مائۃ حاضرہ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب ادام اللہ بالبر والاحسان اس مسئلہ میں کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر اس کے بعد پھر نماز ظہر پڑھنی چاہئے یا نہیں؟

الجواب ہندوستان بفضلہ دارالاسلام ہے یہاں کے شہروں میں جمعہ صحیح ہے اس کے بعد نماز ظہر کی حاجت نہیں ہاں جاہلوں نے جو دیہات میں جمعہ نکال لیا ہے وہاں اگر کوئی جمعہ پڑھے تو اس پر ظہر پڑھنا ضرور لازم ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

অনুবাদ: মাসআলা: ১৫: বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ আলা হযরত আহমদ রেযা খান এর উপর আল্লাহ কল্যাণ ও অনুগ্রহ বর্ধিত করুন। এ মাসআলা সম্পর্কে কি বলবেন যে, জুমআর নামায আদায় করার পর যুহর পড়া উচিত কি না?

উত্তর: হিন্দুস্তান (ভারতবর্ষ) আল্লাহর অনুগ্রহে দারুল ইসলাম। এর শহরসমূহে জুম'আ সহীহ। এরপর যুহরের নামায পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। মুর্খরা গ্রামে জুমআ বের করেছেন। সেখানে কেউ জুমআ পড়লে তার জন্য যুহর পড়া আবশ্যক। কারণ গ্রামে জুমআ হয় না। (আহকামে শরীয়ত, খণ্ড: ২, মাসআলা: ১৫)

উক্ত ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হল আহমদ রেজা খান সাহেব বৃটিশ শাসিত ভারতভূমিকে মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র মনে করতেন। কারণ 'দারুল ইসলাম' অর্থ: ما غلب فيها المسلمون وكانوا امنين

অর্থাৎ যেখানে মুসলমানরা বিজয়ী হয় এবং (ধর্মীয় অনুশাসন পালনে) নিরাপদ।

দারুল ইসলামের শাসকদের গঠনমূলক সমালোচনা করা যায় কিন্তু তাদের শাসনব্যবস্থা ও আদালতকে ঘৃনা করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। যা জঘন্য অপরাধ।

আহমদ রেজা খান সাহেবকে বৃটিশ বিরোধী প্রমাণের জন্য তার জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' বইয়ে যে বক্তব্য লিখা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

'আলা হযরত কেবলা ইংরেজ ও তাদের শাসনকে আন্তরিকভাবে ঘৃনা করতেন। বৃটিশ শাসনামলে ডাক টিকিটের উপর রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি ছিল। আলা হযরত কেবলা তাদের সবকিছু ঘৃনা করতেন। যার ফলে তিনি চিঠি পোস্ট করার সময় খামের উপর ডাক টিকেট উল্টো করে লাগাতেন যাতে রাণী ভিক্টোরিয়ার মাথা নিচে থাকে। অনুরূপভাবে তিনি ইংরেজদের আদালতকেও ঘৃনা করতেন। তার প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কখনো তাদের আদালতে যাবেন না। তিনি ইংরেজদের কোর্টকে আদালত বলতেন না বরং যারা বলতো তাদেরকে নিষেধ করতেন।' (জীবন ও কারামাত)

উক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে রেযা খান সাহেব বৃটিশ শাসন এবং আদালতকে ঘৃনা করতেন, অথচ তার ফতোয়া থেকে প্রমানিত হয় যে, ব্রটিশ শাষন ছিল ইসলামী হুকুমত। আর ইসলামী হুকুমতের বিরোধীতা করা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল।

বি:দ্র: বালাকোট যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের অনেক উলামায়ে কিরাম ভারতবর্ষকে 'দারুল আমান' বলে ফতওয়া দিয়েছেন। 'দারুল ইসলাম ও 'দারুল আমান'-এর মধ্যে শরীয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে বিস্তর প্রার্থক্য রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'জীবন ও কারামত' বই কড়া সুন্নীদের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। উক্ত বইয়ের মূল্যায়নে যারা অভিমত পেশ করেছেন তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম দেওয়া হল:

১. জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নীয়া চট্টগ্রামের শায়খুল হাদীস মুফতী ওবায়দুল হক নাঈমী।
২. জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নীয়া চট্টগ্রামের প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা সুলাইমান আনছারী।
৩. কানযুল ঈমানের অনুবাদক মাওলানা আব্দুল মন্নান।
৪. সৈয়দ মছিউদ্দৌলা।
৫. মাওলানা ওবায়দুন্নাছের নঈমী। প্রমুখ।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের সত্যয়নকৃত বক্তব্যের দ্বারা প্রমানিত হল যে, আহমদ রেযা খান ছিলেন বৃটিশবিরাধী, অথচ তার বক্তব্য থেকে প্রমানিত হয় যে, তিনি বৃটিশ শাষনকে ইসলামী হুকুমত বলেছেন।

আকাবিরে দেওবন্দ কি মীলাদ কিয়াম পালনকারী পীরের ফয়েয লাভ করে বেলায়েতের উচ্চস্থরে পৌঁছেছিলেন?

উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে এক সময় অভিযোগ ছিল যে, তারা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারী তথা ওয়াহাবী। আকাবিরীনে দেওবন্দের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবেও সমালোচনা ছিল। দেওবন্দি উলামায়ে কিরামের শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী এ সকল অভিযোগ খণ্ডন করে 'আশ-শিহাবুস সাকিব' নামে একটি কিতাব লিখেন। উক্ত কিতাবে তিনি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে উলামায়ে দেওবন্দের সাথে ওয়াহাবীদের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি আকাবিরে দেওবন্দ ওয়াহাবী নয়; একথা প্রমাণের জন্য মাদানী সাহেব আকাবিরে দেওবন্দের বিভিন্ন কার্যাবলিও উল্লেখ করেন।

শায়খ মাদানী সাহেব স্বীয় মুরশিদ হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ও হযরত কাসিম নানুতবী সাহেবের ইলমে মারিফতের উচ্চতা ও তাদের উভয়ের ওয়াহাবীদের সাথে সম্পৃক্ত না থাকার কথা প্রমাণের জন্য লেখেন- তারা উভয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে যিকর, ফিকর, ও রুহানী শক্তি লাভ করে পরিপূর্ণ ও পুর্ণাঙ্গ স্তরে উপনীত হন।

আশ-শিহাবুস সাকিব কিতাবের ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় মাদানী সাহেবের বক্তব্য নিম্নরূপ:

(۵) وہابیہ اشغال باطنیہ و اعمال صوفیہ مراقبہ ذکر و فکر و ارادت و مشیخت و ربطۂ قلب
با شیخ و فنا و بقا و خلوت وغیرہ اعمال کو فضول و لغو بدعت و ضلالت شمار کرتے ہیں اور ان اکابر کے
اقوال و افعال کو شرک وغیرہ کہتے ہیں اور ان سلاسل میں داخل ہونا بھی مکروہ و مستقبح بلکہ
اس سے زائد شمار کرتے ہیں چنانچہ جن لوگوں نے دیارِ نجد کا سفر کیا ہوگا یا ان سے اختلاط
کیا ہوگا اس کو بخوبی معلوم ہوگا فیوض روحیہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہیں و مثل ھٰذا
اب ذرا غور فرمائیں اور ان مقدس اکابر کے احوال کی طرف توجہ کریں یہ جملہ حضرات طرقِ صوفیہ
باطنیہ میں منسلک ہیں۔ ریاضت و دوام فکر و ذکر ان کا شعار ہے دونوں حضرات مولانا
نانوتوی و مولانا گنگوہی قدس اللہ اسرارھما نے طرق اربعہ میں حضرت قطب العالم

مولانا الحاج امداد اللہ صاحب تھانوی ثم المکی قدس اللہ سرہ العزیز سے بیعت کی اور
اذکار و افکار و قوی روحیہ میں اس درجہ کو پہنچ کر خلافت و خرقہ اپنے مرشد کامل سے علیٰ
وجہ اتم و اکمل حاصل فرمایا

অনুবাদঃ ওয়াহাবীগণ বাতিনী (শুগুল) কাজকর্মসমূহ, সূফীগণের আমল, মুরাকাবা, যিকর, ফিকর, ইরাদত, মুরশিদের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, ফানা, বাকা ও খিলওত ইত্যাদি আমলসমূহকে অর্নথক, নিষ্প্রয়োজন, বিদআত ও ভ্রষ্টতার মধ্যে গণ্য করে থাকে এবং ঐ সমস্ত বুজুর্গণণের কথা ও কাজসমূহকে শিরক ইত্যাদি বলে থাকে। ঐ সমস্ত সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপছন্দনীয় ও দোষণীয় এমনকি এর চেয়ে ও বেশি কিছু মনে করে। উদাহণর স্বরূপ, যারা নযদে গিয়েছেন অথবা তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন, তারা ভলরূপেই জানতে পারবেন আত্মিক ফয়েজ লাভ তাদের কাছে কোন বিষয়ই নয়। এমনিভাবে একটু চিন্তা করুন এবং তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তারা (দেওবন্দি আকাবিরগণ) সবাই সুফিয়ায়ে বাতিনা তরীকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কষ্ট সহিঞ্চুতা, সার্বক্ষণিক চিন্তা-গবেষণা ও যিকর তাদের অভ্যাস ছিল। এই দুই বুজুর্গ হযরত মাওলানা নানুতুবী ও মাওলানা গাঙ্গুহী (কু.ছি.আ.) চার তরীকার হযরত কুতবুল আলম মাওলানা আলহাজ ইমদাদুল্লাহ সাহেব থানবী মক্কীর কাছে বয়আত গ্রহণ করেন এবং যিকর, ফিকর ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে, তাদের মুরশিদে কামিলের কাছে থেকে পরিপুর্ণরূপে খেলাফত ও তরীকতের সনদ লাভ করেন। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠাঃ ৭৭-৭৮)

মাদানী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় গাঙ্গুহী সাহেব ও নানুতবী সাহেবের কামালাতের উচ্চস্থরে পৌঁছার কারণ ছিল হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.)-এর মুরিদ হওয়া।

আমরা জানি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) নিজে মীলাদ কিয়াম করতেন। হাজী ছাহেব তার 'ফয়সালায়ে হাফ্ত মাসায়েল' কিতাবে লিখেনঃ

اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔

অনুবাদঃ আর অধমের আমল হলো মীলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করি, বরকতের ওসীলা মনে করে মিলাদ অনুষ্ঠান করি এবং কিয়ামের মধ্যে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়ে থাকি। (কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠাঃ ১০৫)

উল্লেখ্যঃ আপন পীর অথবা সিলসিলার উর্ধ্বতন বুজুর্গের উপর আস্থা হারালে তরিকতের সর্ম্পক থাকে না, এটাই হল মুহাক্কিক সূফীগণের সিদ্বান্ত।

দেওবন্দী আকাবিরিনদের কাছে হাকিমুল উম্মত হিসেবে পরিচিত শায়খ মাওলানা আলরাফ আলী থানভী সাহেব মীলাদের কিয়ামকে হারাম অথবা নাজায়িয বলেননি, বরং জরুরী মনে করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দেওবন্দী প্রখ্যাত আলিম সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী লিখিত 'আনওয়ারুল বারী' কিতাব থেকে শায়খ মাওলানা আলরাফ আলী থানভী সাহেবের বক্তব্য তুল ধরছি।

حضرت تھانویؒ قیام والوں کو کہتے تھے کہ اگر تم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہو تو ایک دفعہ تم قیام مت کرو۔ ہمارے ساتھ بیٹھے رہو تو ہم ایک دفعہ تمہارے ساتھ قیام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اس امر کا ثبوت ہوگا کہ قیام کو ناجائز یا حرام ہم بھی نہیں کہتے۔

অনুবাদ: হযরত থানভী কিয়াম পালনকারীদেরকে বলতেন, 'তোমরা যদি এটাকে জরুরী মনে না কর তবে একবার আমার সাথে কিয়াম না করে বসে থাকো। তাহলে আমিও একবার তোমাদের সাতে কিয়াম করতে প্রস্তুত আছি। ইহা একথারই প্রমান যে, তিনি কিয়াম করাকে নাজায়িয কিংবা হারাম বলতেন না। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড:১৭, পৃষ্ঠা:৩০)

সালাফি ওয়াহাবি শহীদদের বারযাখের জীবন কি নবী-রাসুলদের বারযাখের জীবন থেকে উচ্চতর?

হায়াতুন নবী (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরস্থ জীবনে প্রাপ্ত হায়াত) এর ব্যাপারে কোন ঈমানদার মুসলমানের মতবিরোধ নেই। সালাফি ওয়াহাবিরা বিভিন্ন সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেআদবি করার উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁকে যে হায়াত প্রদান করা হয়েছে তা অস্বীকার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। আয়াতটি হলো, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে (সুরা যুমার-৩০)। অথচ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফি ওয়াহাবি ব্যতীত কেউই একথা বলেননি যে, ওফাতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হায়াত প্রদান করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি আয়াত উল্লেখপূর্বক বিষয়টি পর্যালোচনায় নিবিষ্ট হব। আয়াতটি হলো,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না (সুরা বাকারা:১৫৪)। উক্ত আয়াত থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ শহীদদেরকে মৃত না বলে জীবিত বলতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সালাফি ওয়াহাবিরা তাদের যে কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কোন সদস্য নিহত হলে তাকে মৃত না বলে শহীদ, অর্থাৎ জীবিত বলে থাকেন এবং এ বিষয়টি কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী শহীদগণ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি কেবল সালাফি ওয়াহাবি বা তাদের মদদপুষ্ট আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিবর্গের বেলায় প্রযোজ্য হবে নাকি সবার বেলায়? আর এ শাহাদাতের ফলে সালাফি ওয়াহাবি শহীদানের কবরস্থ জীবন কি নবী-রাসুলদের কবরস্থ জীবন থেকে অধিক মর্যাদাপূর্ণ? (নাউযুবিল্লাহ)।

তারা আরেকটি মতবাদ লালন করে থাকেন যে, মৃত্যুই চুড়ান্ত। বস্তুত এ কথাটি সত্য নয়। বরং একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, মৃত্যুর পরও আল্লাহ মানুষকে একটি বিশেষ জীবন দান করেন যার নাম হচ্ছে "হায়াতে বারযাখ" বা বারযাখের জীবন। সুতরাং মৃত্যুর হাকিকত সম্বন্ধে অজ্ঞ সালাফি ওয়াহাবিদের একথা জানা থাকা উচিৎ যে, মৃত্যু মানব জীবনের ইতি নয়। বরং মৃত্যু হলো এক জীবন থেকে অন্য জীবনে পদার্পণ করা। অবশ্য পার্থিব জীবনের সাথে কবরস্থ জীবনের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তবে জীবন আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারা কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা তাদের "মৃত্যুই চুড়ান্ত" কথাটির দলিল প্রদান করে থাকেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ অর্থাৎ, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (সুরা আনকাবুত-৫৭। এ মতবাদ লালন করার মধ্য দিয়ে তারা অনেক সময় কবরের সাওয়াব ও আযাব অস্বীকার করার মত কুফরির দিকেও পা বাড়ান। বস্তুত, উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা প্রতিয়মান হয় না যে, মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই। একটি বিষয়ে জানা থাকা প্রয়োজন যে, আজকের সালাফি ওয়াহাবিগণ শুণ্য থেকে আগমন করেনি। তাদেরও একটি ঐতিহাসিক এবং মতাদর্শগত ভিত্তি রয়েছে। আজকের দিনের সালাফি ওয়াহাবিদের মতাদর্শগত ইমাম হচ্ছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া। তাঁর যোগ্যতম শিষ্য হাফিজ ইবনুল কায়্যিম জাওযী, যিনি সবার কাছেই- বিশেষত সালাফিদের নিকট অত্যন্ত আস্থাভাজন, তিনি মানুষের

রূহের বিষয়ে আলোচনা করে বারযাখের জীবনে মানব-রূহের অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আর-রূহ কিতাবে লেখেন-

فصل وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يعلم أَن مَا ذكرنَا من شَأْن الرّوح يخْتَلف بِحَسب حَال الْأَرْوَاح من الْقُوَّة والضعف وَالْكبر والصغر فللروح الْعَظِيمَة الْكَبِيرَة من ذَلِك مَا لَيْسَ لمن هُوَ دونهَا وَأَنت ترى أَحْكَام الْأَرْوَاح فِي الدُّنْيَا كَيفَ تَتَفَاوَت أعظم تفَاوت بِحَسب تفارق الْأَرْوَاح فِي كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لَهَا فللروح الْمُطلقَة من أسر الْبدن وعلائقه وعوائقه من التَّصَرُّف وَالْقُوَّة والنفاذ والهمة وَسُرْعَة الصعُود إِلَى الله والتعلق بِاللَّه مَا لَيْسَ للروح المهينة المحبوسة فِي علائق الْبدن وعوائقه فَإِذا كَانَ هَذَا وَهِي محبوسة فِي بدنهَا فَكيف إِذا تجردت

وفارقته وَاجْتمعت فِيهَا قواها وَكَانَت فِي أصل شَأْنهَا روحا علية زكيه كَبِيرَة ذَات همة عالية فَهَذِهِ لَهَا بعد مُفَارقَة الْبدن شَأْن آخر وَفعل آخر

وَقد تَوَاتَرَتْ الرُّؤْيَا فِي أَصْنَاف بني آدم على فعل الْأَرْوَاح بعد مَوتهَا مَا لَا تقدر على مثله حَال اتصالها بِالْبدنِ من هزيمَة الجيوش الْكَثِيرَة بِالْوَاحِدِ والاثنين وَالْعدَد الْقَلِيل وَنَحْو ذَلِك وَكم قد رئي النَّبِي وَمَعَهُ أَبُو بكر وَعمر فِي النّوم قد هزمت أَرْوَاحهم عَسَاكِر الْكفْر وَالظُّلم فَإِذا بجيوشهم مغلوبة مَكْسُورَة مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وعددهم وَضعف الْمُؤمنِينَ وقلتهم

অনুবাদ: এখানে এ কথাটিও জেনে রাখা উচিত যে, শক্তিশালী, দুর্বল, বড় ও ছোট হওয়া- তথা বিভিন্ন গুনাবলির প্রেক্ষিতে রূহ সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোন রূহ অনেক বেশি শক্তিশালী আবার কোন রূহ দুর্বল। কোনটা অনেক বৃহৎ হয়ে থাকে। আবার কোনটি অনেক ক্ষুদ্র ও অনেক ছোট। কাজেই বৃহৎ রূহের যে অবস্থা হবে ক্ষুদ্র রূহের সে অবস্থা হবে না। দুনিয়ায়ও রূহ সমূহের আচার আচরনের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অত:পর যে রূহ দেহের বন্ধন ও সম্পৃক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, সে আচার-আচারণে, শক্তিমত্তায়, দুঃসাহসিকতায়, মহান আল্লাহর দিকে দ্রুত উত্তরণে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে যেরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে, সেরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে না ঐ রূহ যা দেহের মধ্যে বন্দী ও অবরুদ্ধ। কাজেই বন্দীত্বের অবস্থায় যখন রূহের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়,

তখন দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার অবস্থা তো ভিন্ন হবেই। কেননা তখন তার মধ্যে তার যাবতীয় শক্তির সমাবেশ ঘটবে। যেহেতু তখন সে তার মূল অবস্থায়ই থাকবে, ফলে তখন সে অধিকতর সাহসিকতা ও উদ্যমের অধিকারী হবে। মৃত্যুর পর রূহের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্বপ্নদর্শনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ঐ সমস্ত স্বপ্নে রূহ-সমূহের মধ্যে এমন সব উচ্চাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ পরিদৃষ্ট হয়েছে, যা দেহের মধ্যে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি বা হতে পারতও না। যেমন এক অথবা দুটি রূহ কিংবা সম্মিলিত কয়েকটি মাত্র রূহ একটি বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করল। অনেকবারই স্বপ্নে দেখা গেছে যে, হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) সহযোগে কাফির ও যালিমদের বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করে দিয়েছেন। দেখা গেছে যে, একটি বিরাট শক্তিশালী বাহিনীকে মুসলমানদের একটি অতি দুর্বল ও ক্ষুদ্র বাহিনী পরাস্ত করে দিয়েছে (আর-রূহ, পৃষ্ঠা:২০২)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরও সৎকর্মশীলদের রূহের কার্যক্রম চালিত থাকে এবং তা আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নবী-রাসুলদের বারযাখের জীবনে তাঁদের রূহানী কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের দ্বারা আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি উপকৃত হয়।

অধিকাংশ আলিম কম অধ্যয়নের ফলে কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য ওয়াহাবীদের অনুসরণ করছেন

দেওবন্দি উলামাদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বুখারী শরীফের দু'টি ব্যাখ্যা গ্রন্থে তারা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে, আজ কালকার দেওবন্দি আলিমগন কম অধ্যয়নের ফলে কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য ওয়াহাবীদের ব্যাপারে নিশ্চুপ। নিম্নে আনওয়ার শাহ কাশমিরী র. এর বিশিষ্ট ছাত্র সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরীর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' এবং দারুল উলুম দেওবন্দ এর প্রাক্তন মুঈনে মুফতি মোহাম্মদ ইদরীস কাসেমী এর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'কাশফুল বারী' কিতাবে এ প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে তা পেশ করা হল। উভয় কিতাবের বক্তব্য এক

হওয়ায় আমরা এখানে কেবল আনওয়ারুল বারীর এবারত ও অনুবাদ উল্লেখ করছি।

আনওয়ারুল বারীর বক্তব্য:

دوسری بات ان غیر مقلدوں کی ہی خوئی قسمت سے یہ بھی ہوگئی کہ نجدی علماء نے کئی بڑے مسائل میں امام احمدؒ کا مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہ وابن قیمؒ کے تفردات کو اپنا لیا ہے، اور انہوں نے ان ہی تفردات پر امام احمد اور اکابر حنابلہ کے فیصلوں کے خلاف جمود کر لیا ہے، پھر بڑی تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ کے بعد اکابر دیوبند میں سے کسی نے بھی نجدی علماء سے قریب ہو کر تبادلہ خیالات کر کے احقاق حق کی سعی نہیں کی، الا یہ کہ حضرت مولانا عثمانی نے فتح الملہم میں یا مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ نے معارف السنن میں کچھ لکھا، یا حضرت شاہ صاحبؒ کے امالی درس میں کچھ آیا ہے، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مدنیؒ بھی درس بخاری شریف میں بہت کچھ فرمایا کرتے تھے، مگر ان کے علوم وتحقیقات بھی پوری طرح سامنے نہ آسکیں۔ اور آج کل کے حضرات جن کا رابطہ سعودی عرب سے ہے، وہ بظاہر کچھ کمی وسعت مطالعہ کے سبب سے اور کچھ اپنی مصالح کی وجہ سے خاموش معلوم ہوتے ہیں واللہ اعلم۔

দ্বিতীয় কথা হল- এই গয়র মুকাল্লিদগনের দুর্ভাগ্য যে, নজদী আলিমগণ কয়েকটি বড়বড় মাসআলায় ইমাম আহমদ (র.) এর মসলক পরিত্যাগ করে হাফিয ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়িম এর ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ করেছেন। আর তারা ইমাম আহমদ (র.) ও পূর্বসূরী হাম্বলীদের সিদ্ধান্তের বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন। অত:পর খুবই কষ্টদায়ক কথা হচ্ছে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবের পর আকাবীরে দেওবন্দের কেউই নজদীদের মুখোমুখী হয়ে সত্য প্রতিষ্টার চেষ্টা করেননি। তবে মাওলানা উসমানী ফতহুল মুলহিমে কিংবা মাওলানা সাইয়্যিদ মোহাম্মদ ইউসূফ বিন্নুরী মা'আরিফুস সুনানে কিছু লিখেছেন। শাহ সাহেবের আমালী দরসে কিছু এসেছে। আমাদের উস্তাদ মুহতারাম মাদানী সাহেব দরসে বুখারীতে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু তাদের তাহকীকগুলো পুরোপুরি সামনে আসেনি । আজ কালকার দেওবন্দি আলিমগণ যাদের সম্পর্ক সউদী আরবের সাথে রয়েছে তারা দৃশ্যত: কম অধ্যয়নের কারণে এবং কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নিরব দেখা যায়। আল্লাহই অধিক জানেন। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড:১৬, পৃষ্ঠা: ৩৮৬; কাশফুল বারী, খণ্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ২৮১)

বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে তাদের অনেকে নীরব না থেকে বরং ওয়াহাবীদের মতবাদের দিকে ধুঁকে পড়েছেন।

নমুনা স্বরূপ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি।

১। দেওবন্দি আকাবিরীণগণের পীর ও মুর্শীদ শায়খুল আরব ওয়াল আযম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর মত বুর্জুগকে মীলাদ-কিয়ামের ব্যাপারে

ফতোয়া প্রদানের কারণে সালাফিদের অনুসরণে বেদআতী সাব্যস্ত করছে। (নাউযুবিল্লাহ)

২। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরী মক্কী (র.) তাঁর মুর্শীদের বাৎসরিক ইসালে সাওয়াব পালন করার কারণে তার বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) ঈসালে সওয়াবের পক্ষে যে ফতোয়া দিয়েছেন তা দেখতে হলে ফয়সালায়ে হাফত মাসআলার সংশ্লিষ্ট মাসআলাটি দেখুন। এসম্পর্কে হাজী সাহেবের বক্তব্য হল- 'এ ব্যাপারে (ঈসালে সওয়াব) আমার কার্য পদ্ধতি হল, প্রতি বছর আমি আমার মুর্শিদের ঈসালে সওয়াব করি। প্রথমে কুরআন পাঠ করা হয়। কোন কোন সময় সুযোগ থাকলে মীলাদ শরীফ পড়ানো হয়। অত:পর শিরনি বিতরণ করা হয়। এবং সওয়াব বখশে দেয়া হয়।' (ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা)।

উল্লেখ্য যে, শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) যার ব্যাপারে দেওবন্দি আকাবিরদের মত হল তাঁকে সর্বক্ষেত্রে চক্ষু বন্ধ করে অনুসরণ করা যায়। তাঁর বক্তব্য থেকেও ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) এর মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বার্ষিক ঈসালে সাওয়াবের ব্যাপারে লেখেন- এটা প্রচলিত নিয়মে খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে উদযাপন না করা হলেও এতে দূষণীয় কিছু নেই। কারণ এতে মন্দ কিছু নেই। বরং জীবিত মৃত সকলেরই উপকার রয়েছে। (ফতোয়ায়ে আযিযী, পৃষ্ঠাঃ ১১৭)

৩। সালাফী ওয়াহাবীদের অনুসরণে নি:শর্তভাবে অনুপস্থিতিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা শিরক ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। অথচ শেখ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে এ ধরনের উক্তিকে খবীস ওয়াহাবীদের উক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। (দেখুন; আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠাঃ ৮৬) অনুপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার বৈধতার ব্যাপারে আরো দেখুন আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর বক্তব্য, যা উল্লেখ করা হয়েছে- মালফুযাতে মুহাদ্দিসে কাশমিরী কিতাবের ২৩৮ পৃষ্ঠায়। আরো দেখুন ইউসুফ বিননূরী ও আবুল গুদ্দা আব্দুল ফাত্তাহ সাহেবের উস্তাদ বিশ্ববরণ্য হানাফী আলিম আল্লামা জাহিদ কাওসারীর বক্তব্য 'মাকালাতে কাওসারী' কিতাবের ২৯৪ পৃষ্ঠায়। তারা সকলেই হাযির নাযিরের আকীদা ছাড়া অনুপস্থিতিতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

৪। তারা সালাফী ওয়াহাবীদের অনুসরণে রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত (মীলাদ) আলোচনার মাহফিলকে বিদআত ও মন্দ কাজ বলে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। অথচ নিজ বুযুর্গদের জন্ম ও শৈশবকালীন ঘটনা বরকতের উদ্দেশ্যে পাঠ করছেন। শেখ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের দ্বারা মীলাদুন্নবীর আলোচনাকে সর্মথন করত: লিখেছেন, ওয়াহাবীরা মনে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বিত্তান্ত আলোচনা করা মন্দ ও বিদঅত কাজ। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠাঃ ৮৮)

৫। বর্তমানে কিছু সংখ্যক দেওবন্দি সালাফীদের অনুসরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপদমস্তক নূর বলা শিরক ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। অথচ দেওবন্দিদেরই বিশিষ্ট আলিম তাবলীগি নেসাবের প্রণেতা মাওলানা জাকারিয়া সাহেব. শামাইলে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাপড়ে উকুন তালাশ করা সম্পর্কীয় একটি হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন, উকুন শরীরের ময়লা আর্বজনা থেকে তৈরী হয় এবং ঘামের করণে বৃদ্ধি পায়। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি নূর ছিলেন। তাতে ময়লা আবর্জনা কোথা থেকে আসবে? (শরহে শামাইলে তিরমিযী, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৪)

উল্লেখ্য, যাকারিয়া সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি নূর ছিলেন। তাহলে তারা কি তাদের শায়খুল হাদীসকে দোষী সাব্যস্ত করার দু:সাহস করবে?

৬। তারা মীলাদুন্নবীর আলোচনাকে নিরর্থক প্রমাণিত করার জন্য এ ধরনের আলোচনার বৈধতার পক্ষে যে সমস্ত হাদীস বুখারী শরীফসহ সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহে আছে তা না জানার ভান করছে এবং তাদের সমর্থকদের কাছে ৪০ বছরের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন গুরুত্ব নেই বলে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদেরই শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার পূর্বসূরীদের এ সম্পর্কিত আকীদা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন- তাদের (দেওবন্দি আকাবিরদের) বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্ববাসীর উপর যত রহমত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবতীর্ণ হবে- হোক তা অস্তিত্বশীল বা অন্য রকম- সকলের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাতে পাক এমনভাবে সম্পৃক্ত যেমন সূর্য হতে চন্দ্র

আলোকিত হয় এবং চন্দ্র হতে আলো হাজার হাজার কাঁচখন্ডে বিকশিত হয়। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠাঃ ৬৪)

বর্তমানে তারা নিজেদেরকে তৌহিদি বলে প্রচারণা চালাচ্ছে এবং এ নামে তারা নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে, অথচ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার 'ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া' কিতাবে লা মাযহাবীদের সর্ম্পকে লিখেছেন তারা মাযহাবপন্থিদের বিরোধিতা করার জন্য নিজেদের নাম রেখেছে তাওহিদি। (দেখুন ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠাঃ ১৫০)

তাবলীগি চিল্লা কি বিদআত নয়?

তাবলীগিরা অনেক সময় বলে থাকেন সকল আমল আদায়ের পদ্ধতি হুবহু কুরআন হাদীসে থাকতে হবে। আর যদি না থাকে তবে তা হবে বিদআত। প্রকৃত ব্যাপার হলো অনেক কাজ এমনও আছে যার মূল ভিত্তি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অথচ কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি হুবহু কুরআন হাদীসে নেই। তাদের এ ধরণের কোন কাজের ব্যাপারে আপত্তি আসলে নির্দ্বিধায় তারাও অনেক জবাব দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ দেওবন্দিদের মুখপাত্র লুৎফুর রহমান ফরায়েজীর লিখিত 'ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দঃ আপত্তি ও খণ্ডন' (যা প্রাকাশিত হয়েছে আহলে হক মিডিয়া প্রকাশনা বিভাগ থেকে) বইয়ে তাবলীগি চিল্লার উপর আপত্তি ও তার জবাব হুবহু নিম্নে পেশ করা হলো-

তাবলীগি চিল্লার প্রমাণঃ

প্রশ্নঃ তাবলীগ জামাতওয়ালারা তাবলীগে যাওয়ার জন্য চল্লিশ দিনের চিল্লার যে দিন-নির্দিষ্ট করেছে এর কোন প্রমাণ নেই। এটি একটি বিদআত। এই বিদআতকে তাবলীগওয়ালারা তাদের মাঝে প্রচলন ঘটিয়েছে। উক্ত বক্তব্যটির সত্যতা এবং ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তরঃ আসলে তাবলীগ জামাতের চিল্লাকে কোন শরয়ী বিধান বলা হয় না। একথাও বলা হয় না যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কোন সুন্নাত; বরং এটি দ্বীনভোলা সাধারণ মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত একটি কোর্স মাত্র। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে দ্বীন বা দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের জন্য ১২ বছর বা ১৪ বছর এ রকম কোর্স চালু করা হয়েছে।

এমকি মাদরাসায়ও এমন পদ্ধতি প্রচলিত। গোটা বিশ্বের দ্বীনী প্রতিষ্ঠান এমন সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করা বা অবস্থান নেয়া বা প্রশিক্ষণ নেয়ার দ্বারা ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

এসব কোনোটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত বিষয় নয়। আবার বিদআতও নয়। কারণ, এসব পদ্ধতিকে কেউ সুন্নাত বলে না। সেই সাথে এই সংখ্যাটিতে সওয়াব জড়িত বলা হয় না; বরং প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

যদি তাবলীগের চিল্লা পদ্ধতি বিদআত হয়, তাহলে মক্কা-মদীনার ভার্সিটিসহ পৃথিবীর সকল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্বীনী কোর্স সম্পন্ন করার সময়সীমাও বিদআত হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি কি এমন কথা বলেন? যদি না বলেন, তাহলে তাবলীগের চিল্লা নিয়ে কেন আহেতুক প্রশ্ন?

ইসলামী বিশ্বে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে-এর সামান্যতম কোন প্রমাণও কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। অথচ তাবলীগের চিল্লার খানিক হলেও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ আপত্তি ও খণ্ডন: পৃষ্ঠা: ৩১৬-৩১৭)

লুৎফুর রহমান ফরায়েযী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো- মাদরাসার সিলেবাস যা কওমী মাদরাসায়ও অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়, তা সুন্নতও নয় বেদআতও নয়। তবে এটা কি? তাহলে তাবলীগি সিলেবাস নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পালন করা সুন্নতও নয়, বিদআতও নয়। সুতরাং এটা নিরর্থক। মোট কথা, এটা তারা জরুরী মনে করেন না বলে দাবি করছেন। অথচ তাদেরই শায়খুল ইসলাম তকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাবলীগ করা ফরযে আইন মনে করে থাকেন। প্রমাণ স্বরূপ তকী উসমানী সাহেবের দরসে তিরমিযী থেকে তার বক্তব্য পেশ করা হলো:

‘কোন কোন সময় তাবলীগের আমির এমন ফায়সালা করে নেন যা শরীয়ত সংগত নয়। কেননা তাবলীগ ও দাওয়াত ফরযে আইন নাকি ফরযে কেফায়া? এ ব্যাপারে তারা বিধিবদ্ধভাবে এ ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগ শুধুমাত্র ফরযে আইনই নয় বরং এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করাই ফরযে

আইন। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করবে না সে ফরযে আইনের তরককারী। এটি মারাত্মক ভারসাম্যহীন কথা। একইভাবে জিহাদের ব্যাপারে এ ধরণের ভারসাম্যহীন কথা শুনা যাচ্ছে।' (দরসে তিরমিযী- খণ্ড:৫, পৃষ্ঠা:২১৪)

তকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো- তাবলীগিরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাবলীগ করা ফরযে আইন মনে করে থাকেন। এটা এক ধরণের পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। উল্লেখ্য লুৎফুর রহমান ফরায়েযী সাহেব তাবলীগি কার্য সম্পাদনের পদ্ধতিকে দ্বীনী কোর্স সম্পাদনের সাথে তুলনা করে সুন্নাতও নয় বিদআতও নয় বলেছেন। তিনি ইহাকে বিদআতে মনদুবা অথবা বিদআতে হাসানা বলার সাহস করেন নাই।

লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব উক্ত বইয়ের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় তাবলীগি কার্যক্রম সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করেছেন। নিম্নে প্রয়োজনীয় অংশটুকু হুবহু তুলে ধরা হলো:-

প্রশ্ন: তাবলীগ জামাতের পুরো নেসাবকে সুন্নাত মনে করা যাবে কী?

উত্তর: তাবলীগের পূর্ণ কার্যক্রমকে আমভাবে সুন্নাত বলা না গেলেও তাবলীগের প্রায় সব কাজই সুন্নাহসম্মত। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন পৃষ্ঠা: ৩৪৪)

সুন্নাহসম্মত ব্যাপারগুলো আলোচনা করার পর লিখেছেন- বাকি দাওয়াত দিতে বের হবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দিনের পদ্ধতি রাখা হয়েছে, যেমন তিন দিন, চল্লিশ দিন, এক বছর, তিন বছর ইত্যাদি।

এ পরিমাণটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রশিক্ষণ ও দাওয়াত পদ্ধতির শৃঙ্খলার জন্য। হুবহু এ পদ্ধতিকে সুন্নাহ বলা যাবে না। বাকি সুন্নাহ বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম হওয়ায় তাও প্রশংসনীয় পদ্ধতি। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন পৃষ্ঠা: ৩৪৫)

উল্লেখ্য- তাবলীগিরা বলে থাকেন যা সুন্নত নয় তাই বেদআত। তাবলীগি কর্মসূচিতে এমন অনেক বিষয় আছে যা সুন্নত নয় অথচ প্রশংসনীয়। যা তাবলীগ জামাতের মুখপাত্র লুৎফুর রহমান ফারায়েজী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল।

লুৎফুর রহমান ফরায়েজী কি লা-মাযহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত নন?

বর্তমান বাংলাদেশী দেওবন্দিদের মুখপাত্র মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজী একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম হলো 'ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দঃ আপত্তি ও খণ্ডন'। তিনি উক্ত বইয়ে দেওবন্দি পূর্বসুরী বুযুর্গানের উপর আপত্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজের পূর্বসূরীদের মতামত পরিত্যাগ করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। এটা হয়ত তার অজ্ঞতার কারনে অথবা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে লা-মাযহাবীদের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে তা করেছেন। উক্ত বইয়ের (পৃষ্ঠাঃ ২৫২-২৫৬) হুবহু একটি প্রশ্ন ও তার জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

'ফযায়েলে আমল' এ কী শেরক আছে?
তাবলীগি নেসাব 'ফযায়েলে আমল' বইয়ের নিম্নোক্ত কথাগুলোকে অনেকে শিরক বলেন। আপনার মতামত কি?

১। ক্ষুধার্থ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে খাদ্যের আবেদন করে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তার নিকট রুটি এল, ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি অর্ধেক রুটি খাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে বাকি অর্ধেক রুটি খেলেন। (ফাযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠাঃ ১৫৫-১৫৬)

২। জনৈক মহিলা খাদেম কর্তৃক মার খাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করলে আওয়াজ এল, ধৈর্য ধরো, ফল পাবে। এরপরেই অত্যাচারী খাদেম মারা গেল। (ফযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯)

৩। অর্থাভাবে বিপন্ন এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের পার্শ্বে হাজির হয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করায় তা কবূল হলো। লোকটি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল যে, তার হাতে অনেকগুলো দিরহাম। (ফাযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠাঃ ১৬২-৬৩)

৪। মদীনার মসজিদে আযান দেয়া অবস্থায় এক খাদেম মুয়াজ্জিনকে প্রহার করায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করল। প্রার্থনার তিনদিন পরই ঐ খাদেম মারা গেল। (ফাযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠাঃ ১৬২-৬৩)

৫। জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসায় ব্যর্থ হওয়ায় ঐ ব্যক্তির আত্মীয় (কর্ডোভার এক মন্ত্রী) আরোগ্যের আবেদন করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরে পাঠ করার জন্য অসুস্থ ব্যক্তিকে একটি পত্রসহ মদীনায় প্রেরণ

করে। কবরের পার্শ্বে পত্রপাঠ করার পরেই রোগীর আরোগ্য লাভ হয়ে যায়। (ফাযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা: ১৬৭)

৬। কোনো ব্যক্তি হুযুরের রওজায় আরজ করায় রওজা হতে হুযুরের হস্ত মুবারক বের হয়ে এলে উহা চুম্বন করে সে ধন্য হলো। নব্বই হাজার লোক উহা দেখতে পেল। এসব কথা কী শিরক নয়? (উপরোক্ত আলোচনা ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩ থেকে নেয়া হয়েছে)

উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যা লিখেছেন নিম্নে হুবহু তা পেশ করা হল-

জবাব: উল্লেখিত ঘটনা এবং এছাড়া নবীজী এর দরবারে আবেদন করা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা কথিত আহলে হাদীস ভাইদের অস্বীকার করা এবং শিরক বলার মূল কারণ হলো একটি আকীদার ক্ষেত্রে তাদের ভ্রান্ত ধারণা। সেই ভ্রান্ত আকীদা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রওজায়ে আতহারে মৃত মনে করা। কিন্ত আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে জীবিত। তবে দুনিয়াবী জীবনের মতো নয়; বরং জীবিত থাকার অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁর মাঝে রয়েছে। যেমন, সালাম দিলে তা শ্রবণ করেন। রওজার সামনে দরূদ পড়লে তা শুনতে পান। আরো দূর থেকে দরূদ পড়লে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌছলে তা তিনি জানতে পারেন। কবরে তিনি ইবাদতে নিমগ্ন আছেন। এ জীবনটা হলো কবরের জগতের বিশেষ জীবন। দুনিয়াবী জীবন থেকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এ কথা মানা আবশ্যক। কিন্ত কবরের জীবনে তিনি বিশেষভাবে জীবিত। যেমন, শহীদরা বিশেষ অবস্থায় জীবিত। যে জীবন দুনিয়াবী জীবনের মতো নয়।

এ হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা । আর লা-মাযহাবী বন্ধুদের আকীদা হলো , নবীগণ কবরে মৃত। জীবিত মানুষের কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁদের মাঝে নেই।

এ আকীদা ভ্রান্তির কারণে ওরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের সামনে কথা বলা বা কিছু আবেদন করাকে শিরক বলে থাকে। যা ওপরে উল্লেখিত সকল ঘটনায় স্পষ্ট।

সুতরাং আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে বিশেষ অবস্থায় জীবিত আছেন, তাই উল্লেখিত ব্যক্তিদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজায় গিয়ে এমন কোনো কিছু চাওয়া , যা মানুষের কাছে চাওয়া যায় -- তা চাওয়াতে শিরক হয়নি। তবে এমন কোনো বিষয় যদি চাওয়া হতো, যা জীবিত মানুষের কাছে চাওয়া যায় না,

সেসব বস্তু চাইলে তা শিরকী কথা হতো। অথচ এরকম কোনো বস্তু উক্ত ঘটনাবলীতে চাওয়া হয়নি, যা জীবিত মানুষের কাছে চাওয়া জায়েজ নয়। যেমন, সন্তান চাওয়া ইত্যাদি।

কিছু অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেন, বি.দ্র. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরে এভাবে চাওয়াটা ঠিক নয়। কেননা , এতে বাহ্যিকভাবে মানুষের মাঝে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর মতো সবকিছু করতে পারেন। তাই এভাবে চাওয়া থেকে বিরত থাকা কাম্য। তবে কেউ যদি নবীর প্রেমে দিশেহারা হয়ে এমনটি করে তাহলে তা ভিন্ন ব্যাপার। কারণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের ওপর কোনো বিধান নেই। যেমনটি ঘটেছে উক্ত বর্ণিত ঘটনাবলীতে। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৪)

তার বক্তব্য থেকে যে কয়েকটি বিষয় আমরা বুঝতে পারলাম তা হলো-

১। জীবিতদের কাছে যা চাওয়া যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের পাশে গিয়ে তার কাছে তা চাওয়া যায়।

২। উল্লেখিত ঘটনায় বর্ণিত ব্যক্তির্বগ ছিলেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সুতরাং তাদের উপর কোন বিধান নেই।

৩। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছেও এ ধরনের চাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪। শায়খ যাকারিয়া সাহেব যে উদ্দেশ্যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন, তিনি তার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তা বাতিল করে দিয়েছেন।

মোটকথা, লা-মাযহাবীদের জবাব দিতে গিয়ে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অনুচিত কাজের কর্তা ইত্যাদি সাব্যস্ত করে লা-মাযহাবীদেরকে সহযোগিতা করলেন। কারণ যে কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত সে কাজ আবার জায়িয হয় কিভাবে। তিনি যদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন তবে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেবের বক্তব্য থেকে সমাধান পেয়ে যেতেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের বক্তব্য নিম্নরূপ- শায়খুল হিন্দ সাহেব কালামে পাকের সূরা ফাতিহার আয়াত "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি" (সুরা ফাতিহা) এর টিকায় লেখেন-

اس ایات شریفہ سے معلوم ہوا کہ اسکی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں دعاء مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الٰہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اسے کرے تو یہ استعانت جائز ہے۔ یہ استعانت درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ (شیخ الہند)

অনুবাদ : এ আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ পাকের সত্তা ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পুর্ণ নাজায়িয। হ্যাঁ যদি কোন

মকবুল বান্দাহকে আল্লাহর রহমতের মাধ্যম এবং (আল্লাহর উপর) নির্ভরশীল মনে করে জাহিরী সাহায্য প্রার্থনা করে তবে এরূপ সাহায্য প্রার্থনা জায়িয। কারণ এমন সাহায্য প্রার্থনা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা (শায়খুল হিন্দ, হাশিয়ায়ে তরজমায়ে কুরআন, পৃষ্ঠা:২)

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল যে, আল্লাহর কোন নেক বান্দাকে মাধ্যম মনে করে এবং (আল্লাহর উপর) নির্ভরশীল মনে করে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়িয।

সম্ভবত: শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেবের আকীদার উপর ভিত্তি করেছেন।

থানভী সাহেবের 'আন-নশরুত তীব' মূল উর্দু কিতাবের স্কেন কপি নিম্নে প্রদান করা হল-

۱۴۶

بعد تسبيح الكتب والدفاتر الكثيرة
وإنا قد أعطيناك عجالة نافعة و
علالة رائعة نستوعبها في المدة
اليسيرة اللهم اغفر لقاريها
وكاتبها وسامعها وحافظها
وراويها ومؤلفها آمين ولنختم
بعدة أبيات هي تحفة مرسلة
إلى جنابه صلى الله عليه وآله وسلم

اور وہ بہی کتب اور دفاتر کثیرہ کی تسبیح کے بعد شخص
مطلع نہیں ہو سکتا اور ہم نے ایسا تلطف فوری اور
دلپسند سیری بخش مجموعہ تم کو دیا جس کو بہت قلیل
مدت میں ضبط کر سکتے ہو اے اللہ اس کے پڑھنے
والے کو اور لکھنے والے کو اور سننے والے کو اور
یاد کرنے والے کو اور کسی کے سامنے نقل کرنے
والے کو اور تالیف کرنے والے کو اور ترجمہ
کرنے والے کو بخش دیجئے آمین -
اور ہم چند ابیات پر اس کو ختم کرتے ہیں جو
آپ کے دربار شریف میں بطور تحفے کے مبلغین صلوۃ وسلام
کے واسطے سے بھیجے جاتے ہیں یہ اشعار مؤلف کے ہیں

لمؤلفه

يا شفيع العباد خذ بيدي — أنت في الاضطرار معتمدي
دستگیری کیجئے میرے نبی — کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی
ليس لي ملجأ سواك أغث — مسني الضر سيدي سندي
جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ — فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی
غشني الدهر يا ابن عبد الله — كن مغيثا فأنت لي مددي
ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف — اے میرے مولا خبر لیجئے مری
ليس لي طاعة ولا عمل — بيد حبك فهو لي عددي
کچھ عمل ہے اور نہ طاعت میرے پاس — ہے مگر دل میں محبت آپ کی
يا رسول الإله بابك لي — من غمام الغموم ملتحدي
میں ہوں بس اور آپ کا در یا رسول — ابر غم گھیرے نہ پھر مجھ کو کبھی
جد بلقياك في المنام وكن — ساترا للذنوب والفندي
خواب میں چہرہ دکھا دیجئے مجھے — اور میرے عیبوں کو ڈھک دیجئے

'আন-নশরুত তীব কিতাবের বাংলা অনুবাদ করেছেন তাফসীরে 'নূরুল কুরআন' এর লেখক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। তার কিতাব থেকে উপরোক্ত কবিতাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা হল-

১. হে মানব জাতির শাফাআতকারী নবী! তুমি আমায় সাহায্য কর। সমস্ত বিপদ আপদে তুমিই আমার সাহায্যকারী।

২. হে আমাদের সর্দার! আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। তুমি ব্যতিত কে আর আমাদেরকে সাহায্য করবে?

৩. সময় আমাদের প্রতিকুলে। হে নবী, তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর।

৪. আমার না আছে কোন ইবাদত, না আছে কোন সৎ কাজ: কিন্তু অন্তরে মহব্বত রয়েছে।

৫. ইয়া রাসুলাল্লাল্লাহ! আপনার করুণার দ্বারই আমার জন্য যথেষ্ট। অত:পর আর কোন বিপদই আমার হবে না।

৬. হে রাসূল! স্বপ্ন যোগে তুমি তোমার দর্শন দান কর। এবং আমার অপরাধসমূহের উপর পর্দা টেনে দাও। (আন-নশরুত তীব, পৃষ্ঠা: ১৪৬)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর বক্তব্যের সংকলন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরা হল-

بخاری شریف میں حدیث شفاعت میں استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد موجود ہے۔ یعنی سب لوگ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر استغاثہ کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر رسول اکرم ﷺ سے استغاثہ کریں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مقربین بارگاہ خداوندی سے استغاثہ جائز ہے ورنہ جو چیز یہاں جائز نہیں وہاں بھی ناجائز ہوتی۔

বুখারী শরীফে শাফাআতের হাদীসে استغاثوا بادم ثم بموسى ثم بمحمد শব্দ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ সব লোক হযরত আদম (আ.) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এর পর মুসা (আ.) এর কাছে, এর পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এর থেকে জানা যায় যে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। নতুবা যা এখানে (দুনিয়াতে) জায়িয নয়, তা সেখানেও (আখিরাতেও) জায়িয হত না। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৪২২)

উপরোল্লিখিত যে সকল ঘটনা বর্ণনা করার কারণে লা-মাযহাবীরা শেখ জাকারিয়া সাহেবের উপর শিরকের ফতওয়া প্রদান করেছে লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব অভিযোক্ত ব্যক্তিবর্গদেরকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বলে শরীয়তের হুকুম থেকে বের করে দিলেন। এ ধরনের অনেক ঘটনা নির্ভযোগ্য সনদে হাদীস, তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে ঘটনাগুলির দ্বারা মুহাদ্দীসীন, মুফাস্সীরীন ও ফকীহগণ দলিল গ্রহন করেছেন, তারা কেউই এ ধরনের ঘটনায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বলেননি।

প্রমাণ স্বরূপ ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র.) মুসান্নফে ইবনে আবু শায়বায় এবং ইমাম বায়হাকী (র.) দালাইলুন নবুওয়াতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা যায়। জলিলুল কদর সাহাবী হযরত বিলাল বিন হারিস মাজানী (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে এক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর শরীফের কাছে আসলেন এবং তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের জন্য রহমতি বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কেননা তারা সবাই ধবংস হয়ে যাচ্ছে (আনোয়ারুল বারী, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৪৮৬)। আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.)-এর ছাত্র আহমদ রেযা বিজনুরী বুখারী শরীফের ব্যাখাগ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করার পরে লিখেছেন, এ ঘটনাটি সাহাবায়ে কিরামের যুগে এক সাহাবী থেকে সংঘটিত হয়েছে। যে ঘটনাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁর কাছে সুপারিশ চাওয়া এবং সম্বোধন করে দুআ চাওয়া হয়েছে। আর তখন ছিল উমর (রা.)-এর খেলাফত কাল। তা ছাড়া মসজিদে নববী সাহাবায়ে কিরামের দ্বারা ভরপুর ছিল। কেউই হযরত বেলালের কাজকে অপছন্দ করেননি কিংবা অনুত্তমও বলেননি। (আনোয়ারুল বারী, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৪৮৬)।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব আনওয়ারুল বারী কিতাবে এ ধরনের একটি ঘটনা থেকে দলিল পেশ করার পরও বিলাল বিন হারিস মাজানী (রা.) কে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত প্রমান করার চেষ্টা করবেন কি? (নাউযুবিল্লাহ)।

অনুপস্থিতিতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দেওবন্দের আকাবীরগণ যেমন: ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.), কাসিম নানুতবী, আশরাফ আলী থানভী বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে অনেক আবেদন নিবেদন পেশ করেছেন। এ আবেদনগুলির বিপক্ষে অভিযোগের জবাব

দিয়েছেন দেওবন্দিদের মুখপাত্র ইউসূফ লুদিয়ানভী সাহেব। পক্ষান্তরে লুৎফুর রহমান সাহেব নিঃর্শতভাবে অনুপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবেদন নিবেদনকে শিরক হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। এটা লা-মাযহাবীদের অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা নিম্নে ইউসূফ লুদিয়ানভী সাহেবের বক্তব্য তুলে ধরছি, যে বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হবে তিনিও নিঃর্শতভাবে আবেদন নিবেদনকে শিরক বলেননি বরং তাদের আকাবিরিনদের এ ধরনের উক্তির একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুপস্থিতিতে তার দরবারে আবেদন-নিবেদন এর ব্যাপারে মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের খলিফা) তার রচিত 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' নামক কিতাবের ৮ম খন্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠায় ফতোয়ার মাধ্যমে শায়খ আহমদ রেযা খান সাহেব ও তার অনুসারীদের জবাব দিতে গিয়ে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি-

অনুবাদঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, বান্দাহর আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং কেউ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ধারণায় সম্বোধন করে যে, তার এই দরখাস্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হবে, তবে তা এমন হবে, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে সম্বোধন করে পত্র লিখছে; কেননা সে জানে যে তার পত্র সম্বোধিত ব্যক্তি পাঠ করবে।

মোটকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির হওয়ার মত ভ্রান্ত আকীদা যদি না থাকে তবে এর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। হ্যাঁ! আকীদা যদি খারাপ হয় তবে সম্বোধন সঠিক নয়।" (আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল্ল, খণ্ডঃ৮, পৃষ্ঠাঃ ২৭৫)

ইউসুফ লদিয়ানভী সাহেবের ফতোয়া থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, হাযির নাযির এর আকিদা না হলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে দরখাস্ত পেশ করা জায়িয হওয়ার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। নিঃশর্তভাবে তা নাজায়িয বললে তাদের আকাবিরিনদের উপর নাজায়িয কাজ করার ফতোয়া আবশ্যক হবে। ঢালাওভাবে যেসকল দেওবন্দিরা নাজায়িয ও শিরক হওয়ার ফতোয়া দিচ্ছেন তারা ওয়াহাবীদের অনুসারী নয় কি?।

এটা লা-মাযহাবীদের ভ্রান্ত আকীদার বিরোধীতা না সহযোগিতা?

সৈয়দ আহমদ রেফায়ী (র.) যখন মদিনা শরীফ রওযা আতহরে যিয়ারতে গেলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে দুরূদ ও সালাম পেশ করে তাঁর দরবারে আরয করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন উপস্থিত হতে পারি নাই তখন আমি রূহ পাঠিয়ে দিতাম। এখন আমি স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছি। আপনার হাত মুবারক বের করে দিন তাতে আমি চুমু খেয়ে ধন্য হব। উক্ত ঘটনাটি ইমাম রেফায়ীর সাওয়াদুল আইনাঈন কিতাবে, ইমাম সুয়ূতীর তবকাতুল হুফ্‌ফাজ কিতাবে, আহমদ ওয়াসিতির মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল মাখযুমীর 'আল আলান' কিতাবে উল্লেখিত আছে। তাছাড়া আরো অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত আছে। শায়খুল হাদীস জাকারিয়া সাহেবের ফাযাইলে হজ্জ কিতাবেও উক্ত ঘটনাটি বর্ণিত আছে। (কোন কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে আছে তা জানতে হলে লুৎফুর রহমান ফরায়িজীর কিতাব 'ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দঃ আপত্তি ও খণ্ডন' দেখতে পারেন।)

নিম্নে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেবের ফাযাইলে হজ্জ কিতাবে বর্ণিত ঘটনাটি তুলে ধরা হলো-

সৈয়দ আহমদ রেফায়ী (র.) প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও সুফী ছিলেন। তাঁর কাহিনী প্রসিদ্ধ। তিনি যখন ৫৫৫ হিজরীতে হজ্জ থেকে ফারিগ হয়ে যিয়ারতের জন্য হাজির হলেন এবং পবিত্র কবরের সামনে দাঁড়ালেন। তখন এ কবিতা পাঠ করলেন, কবিতার অর্থঃ দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রূহকে আপনার খিদমতে পাঠাতাম। সে আমার প্রতিনিধি হয়ে রওজা মুবারক চুম্বন করত। এখন সশরীরে হাজির হবার পালা এসেছে, আপনার হাত মুবারক দিন, যেন আমার ঠোঁট তা চুম্বন করতে পারে।

এ কবিতার পর কবর থেকে হাত মুবারক বের হলো এবং তিনি তা চুম্বন করলেন। (আল হাওয়ী, ইমাম সুয়ূতীকৃত)

বলা হয়, সে সময় মসজিদে নববীতে নব্বই হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলেই এ ঘটনা দেখেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকও দেখেছেন। তন্মধ্যে হযরত মাহবূবে সুবহানী শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়। (ফাযায়েলে আমল,২য় খণ্ড, ফাযায়েলে হজ্ব উর্দুঃ ১৩০-১৩১, বাংলা ফাযায়েলে হজ্বঃ ২৩১) (ফাযায়েলে আমলঃ আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০)

শায়খুল হাদীস জাকারিয়া সাহেব (তার কিতাবে) উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার কারণে লা-মাযহাবীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এটি একটি কুফুরী আকীদা। অভিযোগটি বর্তমান দেওবন্দিদের মুখপাত্র মাওলানা লুৎফুর রহমান ফরায়েযীর ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন কিতাব থেকে তুলে ধরছি-

প্রশ্ন: অধিকাংশ লা-মাযহাবী এ অভিযোগটি উত্থাপন করে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত বের হয়ে এল, আর কবীর আহমদ রেফায়ী তা ধরে চুমু খেলেন। এটি একটি কুফুরী আকীদা। এ বিষয়ে প্রমাণিক জবাব আশা করছি। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা: ১৬৮)

ফরায়েজী সাহেব অনেক দলিল পেশ করে এ ধরণের ঘটনাকে আহমদ রেফায়ী (র.) এর একটি কারামত প্রমাণ করেছেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ফারায়েজী সাহেব উক্ত ঘটনায় বর্ণিত আহমদ রেফায়ী (র.) এর উক্তি 'দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রূহকে পাঠাতাম। আর সে আমার প্রতিনিধি হয়ে রাওজা মোবারক চুম্বন করত।' এ উক্তির অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ওলী আল্লাহগণের রূহের শক্তিকে অস্বীকার করেছেন এবং নিজের আসল রূপ প্রকাশ করেছেন।

ফরায়েজী সাহেবে ওলী আল্লাহগণের রূহানি শক্তি সম্পর্কে সন্দিহান অথবা অজ্ঞতার কারণে উত্তর দিতে গিয়ে বলেন- আহমদ রেফায়ী (র.)-এর বক্তব্য 'অনুপস্থিতে আমি আমার রূহ পাঠিয়ে দিতাম' **কথাটির বাহ্যিক অর্থ নিলে কুফুরীর সন্দেহ বাকী থেকে যায় সুতরাং এর অর্থ নিতে হবে দুরুদ পাঠ করা।** অথচ এ ধরণের বাহ্যিক অর্থ নেয়াটাই দলিল সম্মত। দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করতে পারলে লা-মাযহাবীরাও বাহ্যিক অর্থ মানতে বাধ্য হবে। কারণ তাদেরই আস্থাভাজন ইমাম হাফিজ হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী তার লিখিত 'আর রূহ' কিতাবে দূর দূরান্ত থেকে এক রূহ অন্য রূহের সাক্ষাৎ করার স্বপক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় স্বপ্নযোগে জীবিতদের রূহ মৃতদের রূহের সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীর 'আর রূহ' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

এ প্রসঙ্গে তিনি একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। উক্ত অধ্যায়ে কুরআন হাদীসের আলোকে মৃত ও জীবিতদের পরস্পরের রূহের সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হলো।

সত্য স্বপ্ন বেশ কয়েকভাগে বিভক্ত।

একঃ ইলহামী স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে কোন কথা ঢেলে দেন, যেন আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের মাধ্যমে আপন বান্দার সাথে কথা বলেন। যেমন, উবাদা ইবনে সামিত (রা.) প্রমুখের উক্তি।

দুইঃ তামসীলী স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতারা রূপকার্থে কোন কথা বলে থাকেন।

তিনঃ রূহসমূহের পক্ষ থেকে স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তির রূহ নিজের কোন মৃত আত্মীয় বা প্রিয়জনের রূহ এর সাথে মিলিত হয় এবং তখন ঐ রূহ তাকে কোন কথা বলে দেয়। (আর রূহ, পৃষ্ঠা ৫৬)

উক্ত কিতাবে রূহ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার পর হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী আরও লিখেন, দুনিয়ায়ও রূহসমূহের আচার আচরণের ক্ষেত্রে বিরাট পাথর্ক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাদের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা, তাদের দ্রুততা ও ধীরতা এবং তাদের সাহায্য ও সহায়তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুভূত হয়। (আর রূহ, পৃষ্ঠা ২০২)

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়:

১. জীবিতদের রূহের সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ হয়। সে সাক্ষাতের দ্বারা অনেক ভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন ২. দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় রূহগুলির শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা, তাদের দ্রুততা ও ধীরতা, অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে।

আরও একজন প্রখ্যাত ইমাম ও মুজাদ্দিদ ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতী (র.) ''আল হাওয়ী লিল ফাতাওয়া" গ্রন্থে 'আল মুনজালি ফি তাতায়্যুরীল ওলী' নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। যেখানে তিনি একজন ওলী একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান করার উপর সূফিবাদ বিরুধী যাহিরীদের উত্থাপিত অভিযোগের খণ্ডনে কুরআন হাদীসের আলোকে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সুফিগণ আলমে আজছাম তথা দৈহিক জগত ও রূহানী জগতের মধ্যখানে আরেকটি জগত সাব্যস্ত করেছেন। যার নাম দিয়েছেন আলমে মিছাল।

আর তারা বলেন, সে জগত হচ্ছে দৈহিক জগত এবং রূহানী জগত হতে সুক্ষ্ম। আর এর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন যে, রূহ সমূহের দৈহিক আকৃতি গ্রহন ও (আলমে মিছালে) ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে থাকেন।

এর প্রমান পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের আয়াতে, যার অর্থ: জিব্রাঈল (আ.) একদম মানুষের আকৃতি ধারণ করলেন। (আল হাওয়ী লিল ফাতাওয়া, ১ম

খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২১৮) সুয়ূতী (র.) দীর্ঘ আলোচনা করার পর একটি প্রশ্ন ও তার যে জবাব লিখেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো।

(প্রশ্ন):যদি বলা হয়, একই ব্যক্তি একই সময় দুই স্থানে উপস্থিত হবেন কিভাবে?

(উত্তর): আমি বলি, কোন ওলী যখন তার ওয়ালায়তে পরিপক্ক হয়ে যাবেন তখন তার জন্য রূহানি সুরত ধারন করা সম্ভব হবে এবং আল্লাহর কুদরতে বিভিন্ন আকৃতিতে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা দান করা হবে। আর এটা অসম্ভব নয়। কেননা বিভিন্ন আকৃতি রূহানি সুরত ছাড়া আর কিছু নয়। (আল হাওয়ী লিল ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২০)। ইমাম সুয়ূতী (র.) এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো, ওলী আল্লাহগণের রূহ একই সময়ে তাদের আকৃতি ধারণ করে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তাহলে সৈয়দ আহমদ রেফায়ী (র.) এর মত একজন ওলীকুল শীরোমনির রূহ রাসূলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে রওযা পাকে চুমু খাওয়ার মধ্যে লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব শিরকের গন্ধ পেয়ে অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন কেন? লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব রূহের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে 'আপনার খেদমতে রূহ পাঠিয়ে দিতাম' এর অর্থ লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দুরূদ পাঠাতাম। প্রমাণ স্বরূপ আমরা তার বক্তব্য তুলে ধরছি-

তার বক্তব্য নিম্নরূপ-

সেই হিসাবে শায়েখ আহমদ কবীর রেফায়ী (র.)-এর উক্ত কবিতার অর্থ করতে হবে এভাবে, 'দূরে থাকা অবস্থায় আমি (আহমদ কবীর রেফায়ী (র.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে দুরূদ পাঠাতাম। এখনতো আমি সশরীরে উপস্থিত (রাওযা পাশে) এবার আপনি আপনার হাত মুবারক দিন, যেন আমি তা চুম্বন করতে পারি।'

উপরোক্ত সঠিক ব্যাখ্যা করলে আর উক্ত কথা তথা 'আপনার খিদমাতে রূহ পাঠাতাম' বক্তব্যের মাঝে কোনো কুফুরীর সন্দেহও বাকি থাকে না। আর সুফীদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে এরকম সঠিক ও উপযোগী ব্যাখ্যা করাই হলো উলামায়ে হকের মত যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দঃ আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠাঃ ১১৬)।

লুৎফুর রহমান সাহেবের বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারলাম।

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে রূহ পাঠাতাম এর অর্থ হলো দুরূদ পাঠ করতাম।

২। বাহ্যিক অর্থে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আহমদ রেফায়ী (র.) এর রূহ পাঠাতেন বললে শিরক হবে।

৩। কিরামত স্বরূপ কোন ওলীর রূহ কোন স্থানে গমন করে কিছু করতে পারবে মনে করলে শিরক হবে।

৪। কার্যত তার বক্তব্য এবং তার প্রতিপক্ষ লা-মাযহাবীদের বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কোন বুজুর্গের রূহ কোথাও সফর করা সম্পর্কে শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের ارواح ثلثة কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল-

থানভী সাহেব উক্ত কিতাবের ২৪৭ নং ঘটনায় যা লিখেছেন তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে- একবার মৌলভী আহমদ হুসের আমরুহী ও মৌলভী ফখরুল হাসান গঙ্গুহীর মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া চলছিল। ঝগড়া চলাকালীন সময়ে একদিন মাওলানা রফি উদ্দীন সাহেব মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে তাঁর হুজরায় ডেকে আনলেন। মাহমুদুল হাসান সাহেব দেখলেন মাওলনা রফি উদ্দীন সাহেব ঘর্মাক্ত হয়ে তাঁর লেপ ভিজে গেছে। ঘর্মাক্ত হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বললেন, এই মাত্র কাসিম নানুতবী সাহেব এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বলে গেছেন, মাহমুদকে বলে দাও তিনি যেন এ ঝগড়ায় শরীক না হন। (বিস্তারিত জানতে হলে ارواح ثلثة ২৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

এই ঘটনার হাশিয়ায় আশরাফ আলী থানভী সাহেব লেখেন- এ ঘটনা রূহ এর রূপ ধারন ছিল। এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হল- মিছালী শরীর, আর অন্যটি হচ্ছে উনসুরী শরীর। উনসুরী শরীরে রূহ নিজে উনসুর এর মধ্যে প্রয়োগ হয়ে উনসুরী শরীর তৈরী করে দেয়। কিন্তু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। (বিস্তারিত জানতে হলে ارواح ثلثة ২৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

আশরাফ আলী থানভী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল যে, রূহ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে সফর করতে পারে।

উল্লেখ্য, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, মুরীদ যত দূরে থাকুন না কেন মুর্শিদের ফয়েজ থেকে মাহরুম নয়। বিশেষ প্রয়োজনে মুর্শিদের রূহ মুরীদের কলবে উপস্থিত হয়ে ফয়েজ দান করতে পারে। তাহলে

আহমদ রেফায়ী (র.) মদীনা শরীফ উপস্থিত হয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত মুবারকে চুমু খাওয়া শিরক হয় কিভাবে?

আল্লামা হাফিয ইবনে তাইমিয়ার যোগ্যতম ছাত্র হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী তার লিখিত 'আর রূহ' কিতাবে 'রূহ একটি স্বতন্ত্র দেহ' এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন হাদীসের আলোকে তিনি একশত ষোলটি দলিল উল্লেখ করে তার মতামত পেশ করেছেন। আমরা এই দলিলগুলোর আলোকে বিশুদ্ধ সনদে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। যে হাদীসটির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে সৎ কর্মশীলদের রূহ দূর দূরান্ত পর্যন্ত সফর করে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে। নিম্নে হাদীসটি পেশ করা হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, যাতে তিনি বলেছিলেন, হে বিলাল! জান্নাতে প্রবেশ করার পর আমি সর্বত্রই তোমার পাদুকার খটখট শব্দ শুনেছি। তোমার কাছে এমন কি আমল আছে, যার দ্বারা তুমি ঐ মর্যাদা লাভ করেছ? হযরত বিলাল (রা.) জবাবে বলেন, দিনে অথবা রাত্রে যখন আমার অযূ ছুটে যায় এবং আমি নতুনভাবে অযূ করি, তখন দু'রাকাত নফল নামায পড়ি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই দু'রাকাতের প্রভাবেই তুমি এই মর্যাদা লাভ করেছ। এটা তো জানা কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে যে খট খট শব্দ শুনেছিলেন, তা ছিল হযরত বিলাল (রা.) এর রূহের শব্দ। কেননা তাঁর দেহ তখন পৃথিবীতেই ছিল (যেহেতু তখন তিনি জীবিত ছিলেন)। (আর রূহ, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৩)

(মসনদে ইমাম আহমদ, ইবনে খুযাইমাহ, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮৩)

আমাদের প্রশ্ন হল- বিলাল (র.)-এর রূহ মুবারক বেহেশতে বিচরণ করতে পারলে আহমদ রেফায়ী (র.)-এর রূহ মদীনা শরীফ গমণ করে রওযা পাকে চুমু খাওয়া শিরক হয় কিভাবে?

মিথ্যা অপবাদকারীরা ফাসিক

প্রচলিত পদ্ধতিতে তাবলীগি কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণে দেওবন্দিদের ফকীহুল উম্মত নামে খ্যাত মাওলানা মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী সাহেব যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

تبلیغی جماعت پر اعتراض

ارشاد فرمایا کہ ایک مدرسہ کے مہتمم صاحب نے تبلیغی جماعت پر بطور اعتراض کے میرے پاس خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تبلیغی جماعت کا یہ نصاب عمر میں سات چلے سال میں ایک چلہ مہینہ میں تین دن ہفتہ میں دو گشت اور روزانہ کی تعلیم کہاں سے ثابت ہے میں نے جواب میں لکھا کہ ایسے امور کے ثبوت کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ خلاف شرع نہوں سو یہ خلاف شرع نہیں آپ بتلائیں کہ آپ کے یہاں درس نظامی کا نصاب اور اس کی مدت اتنے سال پہلے سال میں فلاں فلاں کتاب اور دوسرے سال میں فلاں فلاں اسی طرح ہر سال فلاں فلاں نیز سال میں تین امتحان یہ سب کہاں سے ثابت ہے ظاہر ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ خلاف شرع نہیں اور تجربہ شاہد ہے کہ جو اس طرح پڑھ لیتا ہے وہ فاضل بن جاتا ہے اس کے ثبوت کے لئے اتنا ہی کافی ہے بس اسی طرح تبلیغی جماعت کے نصاب کو سمجھ لیجئے۔

অনুবাদ : তাবলীগ জামআতের উপর অভিযোগ। তিনি (মাহমুদুল হাসান) বলেছেন যে, এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব তাবলীগ জামাতের উপর অভিযোগ করে আমার কাছে একটি চিঠি লিখলেন। যাতে লেখা ছিল তাবলীগ জামাআতের নিসাবের মধ্যে আছে, জীবনে সাত চিল্লা প্রদান, মাসে তিন দিনের এক চিল্লা, সপ্তাহে দুইবার গাশ্ত করা এবং দৈনিক তা'লিম ইত্যাদি। এগুলো কোন্ দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়? আমি (মাহমুদুল হাসান) তার জবাবে লিখলাম এমন একটি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইহা শরী'আত বিরোধী নয়। সুতরাং য়েহেতু এ কাজ শরীআত বিরোধী নয় তাই এটা জায়িয। আপনি বলুন আপনাদের দরসে নেজামীর যে নিসাব রয়েছে যেমন: এটা এত বৎসরে শেষ হবে। প্রথম বৎসর অমুক অমুক কিতাব পড়ানো হবে। দ্বিতীয় বৎসর অমুক অমুক কিতাব পড়ানো হবে। এভাবে প্রত্যেক সালের নিসাব প্রণয়ন। তাছাড়া বৎসরে তিনটি পরীক্ষা নেয়া হবে। এগুলি কোন দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয়? প্রকাশ থাকে যে, এর উত্তরে আপনি বলবেন এটা শরীআত বিরোধী নয় এবং অভিজ্ঞতা স্বাক্ষ্য প্রদান করে, যে এভাবে পড়বে সে ফাযিল হয়ে যাবে। আর এটাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাবলীগি জামাআতের নিসাবকে এরূপ মনে করা উচিত। (মালফুযাতে ফকিহুল উম্মাত, মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী, মুরাততিব: মাসউদ আহমদ কাসিমী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা থেকে ইহা প্রমাণিত হয়, কোন কাজ সম্পাদনের নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি শরী'আত বিরোধী না হলে সে কাজ করা নাজায়িয নয়, বিদআতও নয়, এটা দেওবন্দিরাও মনে করেন। কারণ তাবলীগি দাওয়াতের

অনেক আবিষ্কৃত পদ্বতি রয়েছে। মাহমুদুল হাসান সাহেব প্রমান স্বরূপ মাদরাসা সিলেবাসকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

উল্লেখ্য, তাদের মাদরাসাগুলোরও প্রচলিত সিলেবাস রয়েছে। উপরোল্লেখিত সিলেবাসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মেনে চলা হয়। প্রমান স্বরূপ আরো বলা যায়, বুখারী শরীফ সংকলন শেষ হয়েছে ২৩৩ হিজরীতে। দেওবন্দিরা খতমে বুখারী এবং দস্তারবন্দীর যে অনুষ্টান করে থাকেন, এ পদ্বতিতে অনুষ্টান করার প্রমান কোন সাহাবী, তাবিঈ', তাবে তাবি'ঈ থেকে নেই।

তাবলীগিদের নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে ছয় উসূলের মাধ্যমে তাবলীগি দাওয়াত দেয়া। তারা এ ছয় উসূলকে কি পরিমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এ সম্পর্কে তাবলীগিদের হিতাকাঙ্খী আলিম মুফতি তকী উসমানী সাহেবের একটি বক্তব্য হচ্ছে-

'কোন কোন সময় তাবলীগের আমিরগণ এমন ফায়সালা করে নেন যা শরীয়ত সংগত নয়। কেননা তাবলীগ ও দাওয়াত ফরযে আইন নাকি ফরযে কেফায়া? এ ব্যাপারে তারা বিধিবদ্ধভাবে এ ফায়সালা করে নিয়েছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগ শুধুমাত্র ফরযে আইনই নয় বরং এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করাই ফরযে আইন। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করবে না সে ফরযে আইনের তরককারী। এটি মারাত্মক ভারসাম্যহীন কথা। একই ভাবে জিহাদের ব্যাপারে এ ধরণের ভারসাম্যহীন কথা শুনা যাচ্ছে।' (দরসে তিরমিযী- ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৪)

কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম মীলাদুন্নবীর মাহফিলকে নিরর্থক প্রমানিত করার উদ্দেশ্যে রবিউল আউয়াল মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নবী যে বাদশাহর আমলে (বাদশাহ মুযাফফর উদ্দীন আবু সাঈদ আল কাওকাবারী, মৃত্যু: ৫৬৩ হিজরী) শুরু হয়েছিল, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর উপর অপবাদ আরোপ করে বলে থাকে যে, তিনি ফাসিক ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)। এ মিথ্যা দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া' কিতাবের ভাষ্যকে জালিয়াতি করা হয়েছে। অথচ হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) 'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে লেখেন-

وكان مع ذلك شهما شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه

অনুবাদ: তিনি পবিত্র আত্মার অধিকারী, বীর পুরুষ, বিজ্ঞ আলিম, সাহসী, জ্ঞানী ও ন্যায় পরায়ন ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁর ঠিকানাকে সম্মানজনক করুন। (আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ১১৮)

অনুরূপ বক্তব্য ইমাম যাহাবীর 'সিয়রু ই'লামিন নুবালা'সহ নির্ভরযোগ্য সিয়রের কিতাবসমূহে রয়েছে।

ইমাম যাহাবী লেখেন-

وكان متواضعا، خيرا، سنيا، يحب الفقهاء والمحدثين

অনুবাদঃ তিনি ছিলেন বিনয়ী, উত্তম, সুন্নী। ফকীহগণ ও মুহাদ্দিসীনে কিরামকে তিনি ভালবাসতেন। (সিয়রু ই'লামিন নুবালা, খণ্ডঃ ২২, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৬)

হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর (র.) ও ইমাম যহবী (র.) এর উপরের আলোচনা থেকে প্রমানিত হল যে, সুলতান আবু সাঈদ আল-কাওকাবারী বিজ্ঞ আলিম, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ন, সুন্নী এবং ফকীহ ও মুহাদ্দীসগণের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী ছিলেন। এ ধরনের একজন মুমিন বান্দাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করা মুনাফিক ও ফাসিকদের কাজ, যারা আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত।

যারাই মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে এরকম অপপ্রচার করে থাকে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করে আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি স্বরণ করা উচিত।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ

অনুবাদঃ একথা শুনার পর মুমিন নর-নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারনা করে না এবং বলে না যে, 'এটাতো নির্জলা অপবাদ'। (সূরা নূর, আয়াতঃ ১২)

নিঃসন্দেহে এধরণের অপবাদ দেয়ার কারণে তারা ফাসিক হয়ে গেছে।

পরিশেষে রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি-

হযরত বারা বিন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- সুদের ৭২টি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ব নিম্ন দরজা মায়ের সাথে যিনা করার সমপর্যায়ের, আর সর্বোচ্চ দরজা হল নিজ ভাইয়ের মানহানি করা। (মাতালিবুল আলিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২, মাজমা' ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২)

ফতহুল বারী ২য় খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় এবং উমদাতুল কারী ৩য় খন্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে, খুতবার আযান ইমামের সামনে দেয়ার প্রচলন করেছিলেন খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক। তার জন্ম ৭২ হিজরী এবং শাষনকাল ছিল ১০৫ হিজরী থেকে ১২৫ হিজরী পর্যন্ত। হিশাম বিন আব্দুল মালিকের জীবনে অনেক কলঙ্কের দাগ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) ইমাম যায়েদ (র.) এর মাধ্যমে খিলাফতে রাশিদার পুন:প্রতিষ্টার লক্ষে সাহায্য সহযোগীতার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁকে আর্থিক সহযোগীতাও করেছেন। হিশাম বিন আব্দুল মালিক ইমাম যায়েদ (র.) এর মত আহলে বাইতের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তিত্বকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। মোট কথা, এ ব্যাপারে তার ভুমিকাকে অনেকটা ইয়াযীদের ভুমিকার সাথে তুলনা করা যায়। (দেখুন তারীখে ইসলাম, সৈয়দ মুফতি আমীমুল ইহসান রহমতুল্লাহি আলাইহি) এতদসত্ত্বেও ইমামের সামনে খুতবাহর আযান দেয়ার ব্যাপারটি দেওবন্দীসহ দুনিয়ার সকল উলামায়ে কিরাম মেনে নিয়ে এর উপর আমল করছেন। (খুতবাহর আযান সম্পর্কে হিশামের ভূমিকা বিষয়ে আনওয়ারুল বারী, খন্ডঃ ১৭, পৃষ্ঠাঃ ৯৭-৯৮ দেখুন)। কেউ হিশামের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উথাপন করছেন না। পক্ষান্তরে মীলাদুন্নবীর ভিত্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমানিত থাকা সত্ত্বেও একজন পবিত্র আত্মার অধিকারী, বীর পুরুষ, বিজ্ঞ আলিম, সাহসী, জ্ঞানী, ন্যায় পরায়ন, সুন্নী বাদশাহর বিরোদ্ধে অপবাদ আরোপ করা কোন প্রকৃত ঈমানদারের কাজ নয়।

দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের দরসে তাফসির থেকেও তাবলীগি জামাতের বয়ানের সওয়াব উনপঞ্চাশ কোটি গুণ বেশি!!

তাবলীগ জামাতের লোকেরা মনে করেন যে, তাঁদের যেকোনো আমলের সওয়াব অন্যান্যদের আমলের সওয়াব থেকে অধিক। এমনকি তাঁদের মারকাযে রাত্রী অতিবাহিত করার ফযিলত অন্যত্র দরস-তাদরীসে অংশগ্রহণ করা থেকে অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। তাবলীগিদের বিশ্বাস হল, তাঁদের প্রচলিত উপায়ে আমল করার সওয়াব অন্যত্র আমল করার চেয়ে উনপঞ্চাশ কোটি গুণ বেশি সওয়াবের দাবীদার (দেখুনঃ 'আপকে মাসাঈল আওর ইনকা হল', খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ২৮৬)। প্রথমে আমরা মনে করতাম যে, তাঁরা কেবল বিপরীত

মতাবলম্বীদের বিপক্ষেই এসব কথা বলে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তাঁরা উলামায়ে দেওবন্দের দরস-তাদরীসে অংশগ্রহণ করার চেয়েও তাবলীগি মারকাযে জুম'আর রাত্রী অতিবাহিত করাকে অধিক সওয়াবের কাজ, এমনকি ঊনপঞ্চাশ কোটি গুণ বেশি সওয়াবের দাবী করেন। প্রমাণস্বরূপ, দারুল উলুম দেওবন্দের "দারুল ইফতা" ওয়েবসাইটে আগত একটি প্রশ্ন এবং এর জবাবে দেওবন্দের মতামত আমরা অনুবাদসহ তুলে ধরলাম।

★ প্রশ্ন নং ১৫২৯৬২

ہم مستند عالم سے ہر سال رمضان میں دورہ تفسیر القران کرتے ہیں میر یک ساتی کہ اج تبلیغ مرکز کو شب جمعہ کے لیے بیان سے سنے کے لی مرے ساتھ جائے میں نے کہا میرا درس قضا ہو جاتا ہے. وہاں بھی بیاں بھی بیان ہے میرے ساتھ درس کے لئے چلے، تواس نے کہا کہ نہیں ان دونوں میں فرق ہے تبلیغ میں ایک عمل ایک کم پچاس کوکر ڑ ور درجے پر زیادہ ہے- دہ درس سے ثواب میں زیادہ ہے- کیا درس وتدر یس کے علم سے تبلیغ کام یاشب جمعہ سے کم ثواب ملتاہے-

অনুবাদঃ আমি প্রতিবছর রামাদ্বান মাসে নির্ভরযোগ্য আলিমের নিকট তাফসিরে কুরআনের দাওরাহ সম্পন্ন করে থাকি। আমার এক সঙ্গী বললেন, আজ জুম'আর রাত তাবলীগি মারকাযে বয়ান শুনার জন্য আসুন। আমি বললাম, আমার দরসে তাফসির কাযা হয়ে যাবে। বয়ান তো এখানে হচ্ছে, ওখানেও হচ্ছে। সুতরাং আমার সাথে দরসে চলুন। তিনি বললেন, না, এ দুটি বয়ানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাবলীগে একটি আমল "এক কম পঞ্চাশ কোটি" (ঊনপঞ্চাশ কোটি) আমলের সমান। তাবলীগি বয়ানের সওয়াব দরস থেকে অধিক। আমি বললাম, দরস-তাদরীসে কি তাবলীগি কাজ ও জুম'আর রাত্রী জাগরণ থেকে কম সাওয়াব হাসিল হয়?

★ জবাবঃ

مروجہ تبلیغ جماعت کے مرکز میں شب جمعہ گذارنے کویامروجہ تبلیغ جماعت کی تمام سرگرمیوں کو ہر دینی عمل سے انچاس کروڑ درجہ ثواب میں زیادہ اور افضل جانا صحیح نہیں یہ کسی بھی صحیح، حسن یا قابل استدلال حدیث سے ثابت نہیں ، اس لیے آپ تبلیغ جماعت والوں کی غلو آمیز باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کریں-

অনুবাদঃ প্রচলিত তাবলীগ জামাতের মারকাযে জুম'আর রাত্রী অতিবাহিত করা অথবা প্রচলিত তাবলীগি কার্যক্রমকে অন্যান্য দ্বীনি আমল থেকে ঊনপঞ্চাশ কোটিগুণ বেশি মনে করা অথবা উত্তম বলা বিশুদ্ধ নয়। ইহা কোনরূপ সহীহ,

হাসান কিংবা গ্রহনযোগ্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। এজন্য আপনি তাবলীগি জামাতের এসব অহেতুক কথার প্রতি কর্ণপাত করবেন না।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দেয়ার প্রমান

দেওবন্দি উলামায়ে কিরামের একাংশ সলফী লা-মাযহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত- একথার স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী এর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' কিতাবে উল্লেখিত একটি আলোচনা থেকে। আলোচনাটি নিম্নরূপ-

অনুবাদ: আজকালকার দেওবন্দি আলিমগণ যাদের সম্পর্ক সউদি আরবের সাথে রয়েছে, তারা দৃশ্যত: কম অধ্যয়নের কারণে এবং কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্যেশ্যে নিরব দেখা যায়। আল্লাহই ভাল জানেন। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ৩৮৬; কাশফুল বারী, খণ্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ২৮১)

আহলে হাদীস লা-মাযহাবীগণ প্রায় সকল মাসাঈল ও আকাঈদে হাফিয ইবনে তাইমিয়্যাহকে অনুসরন করে থাকেন।

হাফিয ইবনে তাইমিয়্যাহ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুপস্থিতিতে ডাকাকে নিঃশর্তভাবে শিরক বলেছেন। ইবনে তাইমিয়্যাহর এ ধরনের বক্তব্যের জবাাব দিয়েছেন সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী তাঁর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' কিতাবে। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ-

اور دوسرے جملہ "یا محمد انی
اتوجہ بک الی ربی عزوجل فی حاجتی لیقضیہا" میں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان کے توسل سے اپنی درخواست کو
مزید قوت پہنچائی تو اس میں درخواست طلب ہوگئی اور توجہ بذات نبوی ہی حاجت مندی کیلئے شفیع ہوئی اور جب اس غائبانہ خطاب نبوی کی
اجازت بھی تعلیم دعا مذکور کے ضمن میں مل گئی تو ندا غائب کے جواز کا مسئلہ بھی کم از کم حضور علیہ السلام کے حق میں تو ثابت ہوگیا اس لئے
حافظ ابن تیمیہ کا ندا غائب پر مطلقاً تعبیر کرنا درست نہ ہوا تھا، جب یہ توسل بندا غائبانہ حضور علیہ السلام نے اس وقت جائز رکھا تو بعد وفات
نبوی بھی اسی طرح جائز ہونے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

অনুবাদ: আর দ্বিতীয় বাক্য يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عزوجل ليقضي لي حاجتي এর মাধ্যমে রাসূলে পাাক সাল্লালাাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি

মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে তাঁর ওয়াসীলাহ গ্রহণ করে দরখাস্তকে শক্তিশালী করা হয়। তখন দরখাস্তটি আরো পরিপূর্ণ হয়। আর রাসূলে পাকের তাওয়াজ্জুহ দরখাস্তকারীর জন্য সুপারিশকারী হয়ে যায়। আর যখন অনুপস্থিতির সম্বোধনের অনুমতিও উক্ত দু'আ শিখানোর মাধ্যমে মিলে গেল, তাহলে অন্তত:পক্ষে রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে উক্ত বিষয়টি সাব্যস্থ হয়ে গেল। একারণেই হাফিয ইবনে তাইমিয়্যাহর নি:শর্তভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা নাজায়িয বলা সঠিক হয়নি। যেহেতু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাকে সম্বোধন করে ওয়াসীলাহ গ্রহণ জায়িয ছিল, পরবর্তীতে তা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার কিছুই নেই।' (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড: ১৩ পৃষ্ঠা: ৪৩৩)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বক্তব্যটি সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরীর নয়, বরং তাঁর উস্তাদ ও দেওবন্দিদের ইমামুল আসর (যুগের ইমাম) আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.)-এর। কারণ বিজনুরী সাহেব এ গ্রন্থটি লিখেছেন আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর মলফুযাতের সংকলন হিসেবে।

অনুপস্থিতিতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার বৈধতার প্রমানস্বরূপ আমরা মলফুযাতে কাশমিরী গ্রন্থ থেকে একটি আলোচনা তুলে ধরছি।

অনুপস্থিতকে সম্বোধন করা সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী 'মালফুযাতে মুহাদ্দিস কাশমীরী' গ্রন্থে বলেন- আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) বুখারী শরীফের দরস দিচ্ছিলেন। এক সময় তিনি হাসসান বিন সাবিত (রা.) এর কবিতা-

* وجل الخطب وانقطع الاخاء رسول الله ضاق بنا الفضاء

* لعرض محمد منكم وفاء فان ابي والدتي وعرضي

উল্লেখ করলে একজন ছাত্র প্রশ্ন করলেন, يا رسول الله বলা জায়িয আছে কি না? জবাবে তিনি বললেন জায়িয আছে। বলা হল কেন? তিনি বললেন- তেরশ' বছর ধরে السلام عليك ايها النبي বলা হয়ে আসছে। মুর্খদের একথাও জানা নেই যে, সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অদৃশ্য জগতের কোন কিছুকে সম্বোধন করার অর্থই তারা জানে না। এর পর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। আমি অন্য একটি মলফুযে তার দেয়া ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা

করেছি। অর্থাৎ সম্বোধন হবে অন্তরে উপস্থিত থাকার কারণে। ملفوظات محدث (কশ্মীরি পৃষ্ঠা:২৩৮)

দেওবন্দিদের মুখপাত্র মুফতি লুৎফুর রহমান ফারায়েজী তার লিখিত 'ফাযায়েলে আমল: আপত্তি ও খণ্ডন' গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠায় ওসীলার দলীল হিসেবে 'আত-তরগীব ওয়াত-তারহীব' কিতাব থেকে হযরত উসমান বিন হুনাইফ (রা.) এর একটি হাদীসের অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد صلى الله عليه و سلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي فرجع وقد كشف الله عن بصره

উক্ত হাদীসটির যে অংশ দ্বারা সৈয়দ আহমদ রেজা বিজনুরী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুপস্থিতিতে সম্বোধন করার প্রমান পেশ করেছেন সে অংশটি তিনি উল্লেখ না করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ হাদীস দ্বারা সৈয়দ আহমদ রেজা বিজনুরী এবং ইউসূফ বিননুরী এর উস্তাদ যাহিদ কাওসারী 'মাকালাতে কাওসারী' কিতাবেও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুপস্থিতিতে সম্বোধন করার প্রমান পেশ করেছেন। লুৎফুর রহমান ফরায়েজী যে অংশটি বাদ দিয়েছেন তা হচ্ছে-

يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي فرجع وقد كشف الله عن بصره

অনুবাদ: হে মুহাম্মদ (স.) আমি আপনার ওসীলাহ নিয়ে আমার প্রতিপালক এর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হচ্ছি। যেন তিনি আমার চোখের জ্যোতি খুলে দেন। হে আল্লাহ! আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর শাফাআতকে কবুল করুন এবং আমার দুআকে আমার ব্যাপারে কবুল করুন। অত:পর তিনি ফিরে গেলেন এবং আল্লাহ তাঁর চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিলেন।

উল্লেখ্য, হাদীসের যে অংশটি তিনি বাদ দিয়েছেন তা ওসীলাহর দলীলকে আরো জোরদার করে এবং এর পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুপস্থিতিতে সম্বোধন করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটিও সাব্যস্ত করে যেটাকে লা-মাযহাবীগণ শিরক বলে থাকেন।

আল্লামা যাহিদ কাওসারী (১২৯৬ হি:-১৩৪৫ হি:), যিনি মুসলিম বিশ্বের সুন্নী হানফীদের উপর আনিত মিথ্যা অভিযোগসমূহের জবাব প্রদান করে বিশ্বব্যাপী সুন্নী উলামায়ে কিরামের কাছে পরিচিত ও আস্থাভাজন, তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অন্ধ সাহাবীকে শিখিয়ে দেয়া দু'আর হাদীস উল্লেখ করে যে মাসআলা চয়ন করেছেন তা নিম্নরূপ-

وفيه التوسل بذات النبى ﷺ– وبجاهه ونداء له فى غيبته

অনুবাদঃ এতে রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সত্তার ওয়াসীলাহ গ্রহণ এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে ডাকার প্রমান। (মাকালাতে কাওসারী, পৃষ্ঠাঃ ২৯৪)

কিছু অগ্রসর হয়ে তিনি এতদসংক্রান্ত হযরত উসমান বিন হুনাইফ (রা.) এর হাদীস উল্লেখ করে আরো লেখেন-

وهذا توسل به وندائه بعد وفاته صلوات الله عليه– وعمل متوارث بين الصحابة رضوان الله اجمعين–

অনুবাদঃ এটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়সীলাহ গ্রহণ এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁকে আহবান করার দলীল। আর এটা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর ধারাবাহিক আমল। (মাকালাতে কাওসারী, পৃষ্ঠাঃ ২৯৪)

বুযুর্গরা মৃত্যুবরণ করেন না, শুধু একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হন

বাংলাদেশী দেওবন্দিদের মুখপাত্র মুফতি লুৎফুর রহমান ফারায়েজী তার লিখিত 'ফাযায়েলে আমলঃ আপত্তি ও খণ্ডন' গ্রন্থে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেবের উপর উত্থাপিত একটি অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যার শিরোনাম- ''বুযুর্গরা মৃত্যুবরণ করেন না, শুধু একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হন''। এ অধ্যায়ে তিনি লেখেন-

লা-মাযহাবীদের আরেকটি অভিযোগ: উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা হলো, তাদের আউলিয়াগন মরেন না, বরং একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হন।
উত্তর: প্রথমে আমরা ঘটনাটি দেখে নেই।
'এক বুযুর্গ বলেন, আমি এক মুরীদকে গোসল দিয়েছি। সে আমার বৃদ্ধাঙুলি ধরে ফেলল। আমি বললাম, আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেড়ে দাও। আমি জানি যে তুমি মারা যাও নি, একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হয়েছ মাত্র। সে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেড়ে দিল। (উর্দু ফাযায়েলে আমল, ২য় খণ্ড, ফাযায়েলে সাদাকাত: ৪৭৮, বাংলা ফাযায়েলে সাদাকাত: ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)। (ফাযায়েলে আমল: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা: ১৫১)

এ প্রসঙ্গে তিনি অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ-
বিষয়টির খোলাসা: উক্ত ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মৃত্যু মানেই সব একদম নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়। বরং রূহ শরীর থেকে আলাদা হয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই আমরা মৃত্যুকে ইন্তিকাল বলে থাকি। ইন্তিকাল অর্থ হলো স্থানান্তর হওয়া। মৃত্যু মানেই একদম শেষ হয়ে যাওয়া নয়, বরং ইন্তিতকাল তথা স্থানান্তর হওয়া। (ফাযায়েলে আমল: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা: ১৬৪)
উপরোক্ত বক্তব্যই বিভিন্ন শব্দে অনেক শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন।
মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেবকে দায়মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঘটনাটি কয়টি নির্ভরযোগ্য কিতাবে এসেছে তা উল্লেখ করে হালকাভাবে জবাব দিয়েছেন। অথচ সালাফী লা-মাযহাবীরা মৃত্যুর পর রূহের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো করে থাকেন তার জবাব দেননি। সুতরাং এ অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সালাফীদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ইমাম ইবনে তইমিয়ার প্রধান ছাত্র হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযির 'আর রূহ' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।
''যে রূহ দেহের বন্ধন ও সম্পৃক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, সে আচার-আচরণ, শক্তিমত্তায়, দু:সাহসিকতায়, মহান আল্লাহর দিকে দ্রুত উত্তরণে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে যেরূপ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হবে, সেরূপ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হবে না ঐ রূহ যে দেহের মধ্যে বন্দী ও অবরুদ্ধ। কাজেই বন্দীত্বের অবস্থায় যখন রূহদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাদের অবস্থা তো ভিন্ন হবেই। কেননা

তখন তার মধ্যে তার যাবতীয় শক্তির মসাবেশ ঘটবে। যেহেতু তখন সে তার মূল অবস্থায়ই থাকবে, ফলে তখন সে অধিকারী হবে অধিকতর সাহসিকতার ও উদ্যমের"। (আর রূহ, পৃষ্ঠা: ২০২)

মৃত্যুর পর সৎকর্মশীলদের রুহের কার্যকলাপ

সৎকর্মশীলদের মৃত্যুর পর রুহের কার্যকলাপ সম্পর্কে শাহ আব্দুল আজিজ (র:) এর ফতোয়ায়ে আজিজি থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল-
সৎকর্মশীলদের কবরকে সংকীর্ণ কয়েদ খানার মত মনে করা উচিত নয়। কেননা কবরে তাদের জন্য রয়েছে পোশাক, বিছানা এবং আহার্য্য এর মত আরাম আয়েশের বস্তুসমুহ। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সফর করতে পারে। তাদের পূর্বে মৃত্যুবরনকারী আত্মী-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। তাছাড়া কোন কোন সময় তাদেরকে আনন্দ উপভোগ ও অর্ভ্যথনার জন্য নিজের ঘরে নিয়ে আসতে পারে। অনুরুপ প্রতিদিন তাদের মন ভুলানোর জন্য অনেক কিছু দান করা হয়। যাতে তারা দুনিয়ার জীবনকে ভুলে থাকতে পারেন। আরো কিছু অগ্রসর হয়ে শাহ সাহেব লিখেছেন , কবরবাসীগণ আলমে বরযখের মধ্যে যিকর , তেলাওয়াত, নামায , বরকতময় স্থানসমূহে গমন করার মত কাজে ব্যস্ত থাকেন। ..... রোজা ছাড়া সব ধরনের ইবাদত পালন করে তারা বরকতময় সময়গুলোতে যেমন: শবে কদরের রাত্রিতে, জুমার রাত্রিতে দুনিয়ায় এসে তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের সাথে সময় কাটান। এবং ফেশতাদের মাধ্যমে তাদের জীবিত বন্ধু বান্ধবদের সর্ম্পকে অবগত হন ইত্যাদি। (আনোয়ারুল বারী, খন্ড: ১৮ , পৃষ্ঠা: ১৫০ এর বরাতে ফতোয়ায়ে আজিজি, ২য় খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

তাবলীগি নেসাবের উপরও শিরকি ফতওয়া আছে

তাবলীগিরা সব সময় বলে থাকেন যে, আল্লাহ ছাড়া কারো সন্তুষ্টির উদ্যেশ্যে কোন কাজ করা শিরক। কোন মুমিন কর্তৃক এধরনের কথার যে একটি ব্যাখ্যা রয়েছে তা তারা মানতে নারাজ। আর এটা এজন্যই যে, তারা সালাফী ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছেন।
অথচ তাবলীগি নেসাবের লেখক শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেবের এ ধরণের একটি উক্তির কারণে আহলে হাদীস সালাফিরা তাকে মুশরিক

আখ্যায়িত করেছে। প্রমাণস্বরূপ তাবলীগিদের মুখপাত্র মুফতি লুৎফুর রহমান ফারায়েজীর লেখা গ্রন্থ 'ফাযায়েয়লে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন' বই থেকে একটি আালোচনা তুলে ধরা হলো-

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ফাযায়েলে আমল-এর ভূমিকাতেই শিরক?

প্রশ্ন: আহলে হাদীস নামধারী ভাইয়েরা দীর্ঘদিন যাবৎ একটি অভিযোগ করে আসছেন যে ফাযায়েলে আমল-এর ভূমিকাতেই নাকি শিরক রয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের বিজ্ঞোচিত জবাব আশা করছি।

উত্তর: এ অভিযোগটির মিথ্যাচার সর্ম্পকে সম্যক ধারণা লাভ করতে প্রথমেই আমরা ফাযায়েলে আমল-এর মূল উর্দু অনুবাদকৃত বাংলাটি হুবহু উদ্ধৃত করছি:

ভূমিকা: হামদ ও সালাতের পর। মুজাদ্দিদীনে ইসলাম ও যামানার উলামা-মাশায়েখের উজ্জ্বল রত্ন। [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (র)]-আমাকে তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আয়াত ও হাদীস লিখে পেশ করতে আদেশ করেন। এরূপ বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি হাসিল করা আমার মতো গোনাহগারের জন্য গোনাহ-মাফী ও নাজাতের উসীলা। এই আশায় দ্রুত রচনা করে এ উপকারী কিতাব তার খেদমতে পেশ করছি। (ফাযালে আমল, পৃষ্ঠা নং: ৭, প্রকাশনী: দারুল কিতাব, বাংলাবাজার ঢাকা)

(ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ : আপত্তি ও খণ্ডন: পৃষ্ঠা ৩২৫)

ফরায়েজী উক্ত অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে হাদীস দ্বারা চাচাকে (মাওলানা ইলিয়াস সাহেব) বাবার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং বাবার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির নামান্তর লিখেছেন। আসলে ফয়ায়েজী সাহেবের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এসব কসরত করেছেন। নতুবা শেখ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের 'আত তাকাশশুফ' কিতাবে যে কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে আমল করার প্রমাণ রয়েছে।

থানভী সাহেব 'আত-তাকাশশুফ' কিতাবে কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সুন্দর রূপে আমল করার ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। এতে বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যে হদীসটিতে আছে হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.)-এর রাতের বেলা তিলাওয়াত করা এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তা শ্রবণ করা এবং তাঁর প্রশংসা করার বিষয়। থানভী সাহেব উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় 'ফতহুল বারী' কিতাব থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যে হাদীসে রয়েছে

আবু মুসা আশ'আরী (রা.)-এর উক্তি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি যদি জানতাম আপনি আমার তিলাওয়াত শুনছেন, তাহলে আমি আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম। থানভী সাহেব উক্ত হাদীসদ্বয়ের আলোকে দীর্ঘ আলোচনা করে লেখেন- 'উক্ত হাদীসের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, মাকবুল বান্দাহগণের অনেক ফযীলত রয়েছে। তাদের সন্তুষ্টি কামনা করা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করার মত যদি উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য না থাকে। (আত-তাকাশশুফ, পৃষ্ঠাঃ ২৫১)

থনভী সাহেহবের 'আত-তাকাশশুফ কিতাবে উল্লেখিত দু'টি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল-

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لأَبِى مُوسَى « لَوْ رَأَيْتَنِى وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ».

অনুবাদঃহযরত আবু মুসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু মুসা (রা.)কে বলেন, গত রাতে যখন আমি তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম, তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে তবে খুশি হতে। নিশ্চয়ই তোমাকে দাউদ (আ.) এর লেহেন দান করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

وزاد في رواية البرقاني عن مسلم: لو علمت والله يا رسول الله انك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا–

বুরকানী মুসলিম এর বর্ণনায় আরেকটু বর্ধিত করে বর্ণনা করেন- আল্লাহর কসম ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যদি আমি জানতাম আপনি আমার তিলাওয়াত শুনছেন, তবে আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য খুব সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম। (আবু ইয়া'লা মুসলিম এর শর্তে একটি সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, এমনিভাবে ফতহুল বারীতেও রয়েছে।)

আপন মুর্শিদের সাথে বেআদবীর প্রতিকার

শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.)-এর অনুসারী হয়েও অনেকেই মীলাদ কিয়াম অস্বীকার করার উদ্যেশ্যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.)-এর ব্যাপারে পরোক্ষভাবে কটুক্তি করে

থাকেন। অথচ শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের সিদ্ধান্ত হল কেউ মুর্শিদের প্রতি কটুক্তি করলে প্রথমে তাকে বাঁধা দিবে। এর পরও সে তা থেকে বিরত না হলে সামর্থ থাকলে তাকে জুতা দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করবে। নিচে আমরা 'মালফুযাতে কামালাতে আশরাফিয়া' কিতাব থেকে থনবী সাহেবের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

صبر و تحمل کی تعلیم

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی مرشد کو برا بھلا کہے تو اس وقت کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا کہ اس کو روک دے کہ میرے سامنے ایسا تذکرہ مت کرو مجھ کو صدمہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی ہمت ان شاء اللہ نہ ہوگی۔ اور اگر صبر نہ ہو سکے اور پوری قدرت ہو اور کسی مفسدہ کا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت بحفظ حد شرعی جوتہ سے ٹھیک کر دے۔ اگر قدرت نہ ہو اور وہ روکنے سے نہ رکے تو

অনুবাদ: এক ব্যাক্তি প্রশ্ন করলেন, কেউ যদি তার মুর্শিদকে ভাল মন্দ বলে থাকে তাহলে এ সময় কি করতে হবে? তিনি উত্তর দিলেন তাকে এই বলে বাঁধা দিতে হবে যে, আমার সামনে এমন কথা বল না, আমার কষ্ট হচ্ছে। ইনশা আল্লাহ, তারা সাহস হবে না। যদি সে বিরত না হয়, তাহলে ক্ষমতা থাকলে এবং ফসাদের আশংকা না থাকলে শরীআতের সীমার ভেতরে থেকে তাকে জুতা দিয়ে ঠিক করবে। আর ক্ষমতা না থাকলে সে স্থান ত্যাগ করবে। (মালফুযাতে কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা: ১৮৮ সংকলক: মাওলানা মুহাম্মদ উসমান)

উল্লেখ্য যে, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) ছিলেন শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ও মাওলানা কাসিম নানুতবী সাহেবের পীর ও মুর্শিদ।

সকল সিলসিলাহর সত্যনিষ্ট অনুসারীরাই আপন মুর্শিদের নাম অমর রাখার উদ্যেশ্যে বিভিন্ন কাজ করে গেছেন। দেওবন্দী সিলসিলাহর বুযুর্গগণ নিজ নিজ মুর্শিদের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্টান করেছেন। কেউ কেউ কিতাব রচনা করে মুর্শিদের নামের দিকে সম্বোধন করে এর নামকরণ করেছেন। যেমন- ইমদাদিয়্যাহ, আশরাফিয়্যাহ, কাসিমিয়্যাহ, হুসাইনিয়্যাহ, মাদানিয়্যাহ, মাহমুদিয়্যাহ ইত্যাদি। ফুরফুরা সিলসিলাহর বুযুর্গগণও অনুরোপ সিদ্দিকিয়্যাহ,

সালেহিয়্যাহ ইত্যাদি নামে অনেক কিছু করেছেন। দু:খজনক হলেও সত্য বদরপুরী তরীকার বর্তমান সময়ের কোন কোন বুযুর্গ যারা বয়আত গ্রহণের সময় এবং বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকায় যাকে আপন মুর্শিদ বলে উল্লেখ করছেন, তার নামে কোন কিছু করাতো দূরের কথা, যা করছেন নিজের নামেই করছেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনেককেই দেখা যারা তাঁর পীর ও মুর্শিদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে তাঁর পীর ও মুর্শিদের সমালোচনা করতেও দেখা যায়। এর কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। আল্লাহই অধিক জানেন।

বাগদাদের কিছু সংখ্যক হিংসুক আলিম আল্লামা রুমী (র.) কে তাঁর মুর্শিদ শমছে তবরিযীর কাছ থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে দৃঢ়পদ রয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি 'মৌলভী এ রূম' থেকে 'মাওলানায়ে রূম' এ পরিনত হয়েছিলেন। জৌনপুরী তরীকার উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের মুসাহিবদের দ্বারা সম্ভবত: প্রভাবিত হয়ে আধ্যাত্মিকতার উন্নতির পথে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছেন।

স্মরণ রাখা উচিৎ, তরীকায়ে তাসাউফে অকৃতজ্ঞতার কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বরেন্য কিছু সুফীর উক্তি আমরা তুলে ধরছি। সুফী সাধক শেখ সাদী (র.) তার গুলিস্তাঁ কিতাবে বলেন-

سگے را لقمہ ہرگز فراموش ☆ نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ

وگر عمرے نوازی سفلہ را ☆ بکمتر چیزے آید با توں در جنگ

অনুবাদ: কুকুর কখনও এক লোকমারও কৃতজ্ঞতা হারায় না। যদিও তুমি একে শতবার পাথর নিক্ষেপ কর। আর তুমি যদি সমস্ত জীবন দিয়ে কোন ইতর লোককে প্রতিপালন কর আর সামান্য বস্তু নিয়েও মতভেদ উপস্থিত হয় তবে সে লড়াইয়ে উপনীত হবে। (গুলিস্তাঁ, ৮ম অধ্যায়)

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপকারিতা সম্পর্কে ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী (র.) (জন্ম: ৩৭৬, মৃত্যু: ৪৬৫) এর 'আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ' হতে নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে-

وقيل: عرض على بعض الأسراء مملوك بألف درهم، فلما أحضر الثمنَ استكثره فبدا له في شرائه فردَّ الثمن إلى الخزانة! فقال العبد: يا مولاي، اشترني، فإن فيَّ بكل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوي أكثر من ألف درهم، فقال: وما هي؟ فقال:

أقلها وأدناها ما لواشتريتني وقدمتني على جمع مماليكن لا أغلظ في نفسي، وأعلم أني أنا عبدك. فاشتراه.(الرسالة القشيرية)

অনুবাদ: বলা হয়ে থাকে, কোন এক হাকিমের সম্মুখে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করার জন্য এক গোলাম হাযির করা হলো। যখন হাকিম মূল্য নিয়ে আসল তখন খেয়াল করল (এর) মূল্য অনেক বেশী। অতঃপর সে মূল্য তার ভান্ডারে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ গোলামটি বলল, হে মুনিব! আপনি আমাকে ক্রয় করুন। কেননা আমার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা হাজার দিরহামের চেয়েও বেশী মূল্যবান। হাকিম বলেন, সে বৈশিষ্ট্যটি কী? সে বলল, এর মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প ও হীনতম বৈশিষ্ট হলো, আমাকে যদি আপনি ক্রয় করেন এবং আপনার সকল গোলামের উপর আমাকে প্রাধান্য প্রদান করেন তথাপিও আমি নিজেকে বড় মনে করব না। বরং আমি নিজেকে আপনার গোলামই মনে করব। অতঃপর হাকিম গোলামটিকে ক্রয় করে নিলেন। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)*

বর্ণিত ঘটনায় গোলামের কৃতজ্ঞতাবোধের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট।

আল্লামা রূমী (র.) এর 'মসনবী' থেকে একটি কবিতার দু'টি লাইনের অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা হল-

'পীরের ওসীলাহ অবলম্বন কর। কেননা পীর ব্যতিত সুলুক ও তরীকতের পথ (নফস ও শয়তানের দুষ্টুমি) ভয়াবহ বিপদ আপদ, ভয় ভীতি ও সংকটে পরিপুর্ণ। ওহে পছন্দসই ব্যক্তি! তোমার মাথার উপরে যদি মুর্শিদের (শিক্ষা-দিক্ষার) ছায়া না থাকে, তবে শয়তানের ওয়াসওয়াসার ধ্বনি তোমার অন্তরে বাজতে থাকবে এবং) তোমাকে সদা-সর্বদা অতিষ্ট করে তুলবে। (মসনবী, 'পীরের পরিচয় ও তাঁর অনুসরন' অধ্যায়)

যে সকল বুযুর্গদের মুসাহিবগণ তাদের বুযুর্গদের মুর্শিদের সাথে বেআদবী করেন, ঐ বুযুর্গের উচিৎ হল তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আর এটাই হল সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ। এ প্রসঙ্গে ইউসূফ কান্দুলভী সাহেবের 'হায়াতুস সাহাবা' কিতাবের الغضب للاكابر (বড়দের সম্মান না করার কারণে রাগান্বিত হওয়া) অধ্যায়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

عن أم موسى، قالت: بلغ علياً أن ابن سبأ يفضله على أبي بكر وعمر فهم علي بقتله فقيل له: أتقتل رجلا إنما أجلك وفضلك؟ فقال: لا جرم لا يساكنني في بلدة أنا فيها-(اخرج ابو نعيم في الحلية)

অনুবাদঃ হযরত উম্মে মূসা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত আলী (রা.) এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, ইবনে সাবা হযরত আবু বকর ও হযরাত উমর (রা.) এর উপর তাঁকে সম্মানিত মনে করে। ইহা শুনে তিনি তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করেন। তাঁকে বলা হল- আপনি কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবেন যে আপনাকে অধিক সম্মানী ও মর্যাদাবান মনে করে। হযরত আলী (রা.) জবাব দিলেন- এটা আবশ্যক যে, সে যেন সেই শহরে না থাকে যেখানে আমি বসবাস করছি। (হুলিয়াতুল আউলিয়া)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হল যে, কেউ যদি কারো বুযুর্গের সাথে বেআদবী করে তবে তার জন্য উচিৎ হল তাকে শাস্তি দিয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করা।

নূরে মুহাম্মদীর সাথে সর্ম্পক ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর নিকট অত্যন্ত নির্ভযোগ্য একটি কিতাব হলো 'আল ইবরিয' যে কিতাবটি লিখেছেন আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.)।

আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.) সম্পর্কে কয়েকজন ইমামের মতামত নিম্নে দেয়া হল-

ইমাম যহবী (র.) এর মতে তিনি ছিলেন ইমাম, কুদওয়াহ, আবিদ, যাহিদ, শায়খুল আরিফীন। (সিয়রু ইলামিন নুবালা, খণ্ডঃ ২১, পৃষ্ঠাঃ৭৭)

ইমাম তাজ উদ্দীন সবকী (র.) এর মতে 'অন্যতম আরিফ ও আল্লাহর ওলী, চমৎকার জাঁকালো কারামাতের অধিকারী এবং এ পথের অগ্রজদের অন্তর্ভুক্ত। (তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়্যাতুল কুবরা, খণ্ডঃ ৬, পৃষ্ঠাঃ২২)

ইমাম ইবনে খাল্লিকানের মতে তিনি নেককার বান্দাহ, শাফিয়ী ফকীহ ছিলেন। তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়্যা ২য় খণ্ডঃ পৃষ্ঠাঃ ৫)

শাহ সাহেবের লিখিত 'মশকিলাতুল কুরআন'সহ অন্যান্য কিতাবে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধানের উদ্যেশ্যে ইবরিয কিতাব থেকে অনেক উদ্ধৃতি পেশ করাই কিতাবটি নির্ভযোগ্য হওয়ার প্রমাণ। শাহ সাহেবের ছাত্র সৈয়দ আহমদ রেজা বিজনুরী দেওবন্দিদের কাছে অত্যন্ত উচ্চস্থরের আলিম হিসাবে স্বীকৃত। তার লিখত বুখারী শরীফে ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' এর 'কিতাবুল ইলম' অধ্যায়ের শেষ দিকে নূরে মুহাম্মদীর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি বক্তব্য পেশ করেছেন। ইনশাআল্লাহ, তার বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হবে নূরে মুহাম্মদীই নূরে ঈমানের উৎস। প্রথমে আমরা আনওয়ারুল বারী থেকে আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি। তিনি ১২শতাব্দীর শরী'আত ও

তরীকতের জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে নবুওত সম্পর্কিত খুবই উঁচু স্তরের জ্ঞানগর্ভ কথা বর্ণিত আছে।। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এমন কামিল লোকের অস্তিত্ব নবী রাসূলগণের ইলম ও পরিপুর্ণতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস লাভের একটি মাধ্যম। তাঁর ইলম ও আমলের পরিপূর্ণতা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই কেবল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁকে এমন অনুগ্রহ ও নি'আমতের প্রতিফলন। শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এমন অন্তরদৃষ্টি দান করা হয়েছিল যে, তিনি হাদীস ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য করে নিতে পারতেন এবং বলতেন, এতদোভয়ের নূর আলাদা আলাদা। সহীহ হাদীস থেকে মওযু' হাদীসকে পৃথক করে নিতে পারতেন। বলতেন, মওযু' হাদীসের মধ্যে নূর নেই। কোন কোন সময় সহীহ হাদীসের সাথে মওযু' হাদীসের অংশ বিশেষ মিলিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে সাথে সাথে বলে দিতেন, এতটুকু সহীহ আর বাকী অংশ মওযু'। নবীগণের জীবনী এমনভাবে বলে দিতেন যেন তিনি তাঁদের সাথে জীবন কাটিয়েছেন। কুরআন হাদীসের জটিল বিষয়সমূহ সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ মুবারকের দিকে মনোনিবেশ করে পরিস্কার জবাব দিয়ে দিতেন। (আনওয়ারুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৩৪)

নূরে মুহাম্মদীর সাথে ঈমানের সম্পর্ক

ঈমানদারগণ নূরে মুহাম্মদীর আলোচনা গুরুত্ব সহকারে করে থাকেন। কারণ ঈমানের সাথে নূরে মুহাম্মদীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নূরে মুহাম্মদীর সাথে ঈমানের সম্পর্কের ব্যাপারে আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.) যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হল।

نور ایمان کا تعلق نور محمدی سے

آخر کتاب الایمان میں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے کلمات "ابریز" سے نقل کیے جاتے ہیں تاکہ دلوں کی روشنی بڑھ جائے اور نور ایمان میں قوت ہو (بقاء وجود کا) مادہ ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے چلا ہے نور کے ذروں میں کہ نور محمدی سے نکل کر انبیاء، ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے۔ اور اہل کشف کو اس استفاضہ نور کے عجائب وغرائب کا نظارہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک صالح شخص نے دیکھا کہ آں حضرت ﷺ کے نور مکرم سے ملا ہوا ایک ذرا ہے کہ کچھ دور تک وحدہ درخت کی طرح اکیلا چلا گیا ہے پھر اس میں سے نوری شاخیں نکلنی شروع ہوئیں اور ہر شاخ ایک نعمت سے جو ذوات مخلوق کو منجملہ نعمتوں کی عطا ہوئی ہے جا ملی ہے۔

اسی طرح نور ایمان کو بھی نور محمدی کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ جہاں یہ تعلق العیاذ باللہ قطع ہوا فوراً ہی نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

اللهم نور قلوبنا بانواره وبركاته وفيوضه صلى الله عليه وسلم. واعنا على
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

অনুবাদ: (আহমদ রেযা বিজনুবী লিখেন) কিতাবুল ঈমানের শেষ দিকে শেখ আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.)-এর 'ইবরীয' কিতাব থেকে কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি যাতে অন্তরে নূরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টিকুলের ঈমানদীপ্ততার অস্তিত্ব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তা থেকে। নূরে মুহাম্মদী থেকে নূরের রজ্জু বের হয়ে নবী, ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির দিকে পৌছেছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগনের উক্ত নূর থেকে আচানক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এক সৎকর্মশীল ব্যক্তি দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি রশি মিলিত হয়ে গেছে। কিছু দূর পর্যন্ত ডাল-পালাহীন বৃক্ষের মত চলে গেছে। অত:পর তা থেকে নূরের ডাল পালা বের হতে শুরু করেছে এবং সৃষ্টি জগতের প্রত্যেককে যত নিআ'মত প্রদান করা হয়েছে প্রতিটি নিআ'মতের সাথে এক একটি ডাল মিলিত হয়েছে। এমনিভাবে নূরে মুহাম্মদীর সাথে নূরে ঈমানকে বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেখানে এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সাথে সাথে ঈমান হরা হয়ে যাবে। (আনওয়ারুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬)

নূরে মুহাম্মদীর সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করার কারণে ঈমানহারা হয়ে মৃত্যু

আনওয়ারুল বারী গ্রন্থকার অন্যান্য মাশাইখগণের বাণীর পাশাপাশি শায়খ দাব্বাগ (র.)-এর কিছু বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা হল।

شیخ دباغ کے ارشادات

فرمایا کہ (بقا و وجود
کا) مادہ ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے نور کے ذروں میں چلتا ہے کہ نور محمدی سے نکل کر انبیاء ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے اور اہل کشف کو اس مستفیض نور سے عجائب وغرائب کا مشاہدہ ہوتا ہے حق تعالیٰ نے نور ایمان بلکہ ہر نعمت کے نور کو نور محمدی کے ساتھ وابستہ کیا ہے جہاں یہ تعلق معاذ اللہ قطع ہوا فوراً ہی نور ایمان سلب ہوا۔ مریدین میں سے ایک بدنصیب شخص مزوج نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف ایمان کی رہبری ہوئی ہے کہ حق کا راستہ دکھا دیا باقی رہا ایمان سو وہ اللہ کی طرف سے ہے (ذات محمدی کو اس سے کوئی تعلق نہیں) شیخ موصوف نے فرمایا اچھا اس تعلق کو جو تمہارے نور ایمان اور نور محمدی میں قائم ہے اگر ہم قطع کر دیں اور محض راستہ دکھانا جو تم کہہ رہے ہو باقی رہنے دیں تو کیا تم اس پر راضی ہو گا؟ اس نے کہا ہاں! میں اس پر راضی ہوں وہ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ صلیب کو سجدہ کیا اور اللہ و رسول کا انکار کیا اور اسی پر دم نکل گیا۔

অনুবাদ: শেখ দাব্বাগ (র.)-এর বাণি: তিনি বলেন সৃষ্টিকুলের অস্থিত্বশীলতার ভিত্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্ত্বা থেকে নূরের রজ্জুর মাধ্যমে বের হয়ে নবী, ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির দিকে পৌছেছে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের উক্ত নূরের ফয়েয ও বরকতে আচানক ও বিরল দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। যেখানে এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সাথে সাথে ঈমানহরা হয়ে যাবে। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক সন্দেহ পোষণকারী বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল পথ প্রদর্শনকারী ছিলেন। ঈমানের সম্পর্ক কেবল আল্লাহর সাথেই। (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্ত্বার সথে এর কোন সর্ম্পক নেই।) দাব্বাগ (র.) বলেন, আচ্ছা, তোমার মধ্যে এবং নূরে মুহাম্মদীর মধ্যে যে সর্ম্পক রয়েছে তা যদি আমি কেটে দেই, আর তোমার কথা অনুযায়ী কেবল পথপ্রর্দশের সম্পর্ক বাকী রেখে দেই, তাতে কি তুমি রাজি আছে? সে বলল, আমি রাজি আছি। কথা শেষ না হতেই সে ক্রুশ কে সিজদাহ করল, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করল। আর এভাবে সে মারা গেল। (আনওয়ারুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫)

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর ফুয়ুযুল হারামাইন, ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

এ ব্যাপারে ইমাম আলুসী (র.) এর লিখিত তাফসীরে রূহুল মাআনি থেকে আরো কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল। তিনি وما ارسلناك الا رحمة للعلمين এর তাফসীরে লেখেন-

وكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الإلهي على الممكنات على حسب القوابل ولذا كان نوره صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات ففي الخبر أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر وجاء الله تعالى المعطي وأنا القاسم

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের জন্য রহমত হওয়া এ দৃষ্টিকোন থেকে যে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যম। এ কারনে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর হচ্ছে সর্ব প্রথম সৃষ্টি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হে জাবির, আল্লাহ তাআ'লা তোমার নবীর নূরকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন। আরো বর্ণিত আছে, আল্লাহ হচ্ছেন দাতা আর আমি বণ্টনকারী। (তাফসীরে রূহুল মাআ'নি)

হায়াতুন্নাবী আকিদার ব্যপারে আহলে সুন্নত ও সালাফী লা-মাযহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

গয়র মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর তাঁর হায়াতের ব্যপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের আকিদা হল, ঘুমন্ত মানুষের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে শুয়ে আছেন। তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। প্রক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর শরীফে স্বশরীরে জীবিত। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। উম্মতের আমল তার সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করেন। তাছাড়া তার রূহানী শক্তি ইহধাম ত্যাগ করার পর অনেক গুণ বেড়ে গেছে। (বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম সুয়ুতী (র.) এর আল হাওয়ী, ২য় খণ্ড, ২৫৫-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।) এব্যপারে দেওবন্দি আকাবিরগণেরও কোন দ্বিমত নেই। তাদের মুনাযিরে আযম আমিন সফদর উকাড়বি সাহেব খুতবাতে সফদর দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদের হায়াতুন্নবীর বিরোধিতার জবাব দিয়েছেন। উক্ত কিতাবে ২৮২ পৃষ্ঠায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতে বরযখীর ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের কয়েকটি অভিযোগ· উল্লেখ করেছেন। অভিযোগ হল যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স তেষট্টি বছর হওয়ার ব্যপারে ইজমা সংগঠিত হয়ে থাকে আর তিনি জীবিত মেনে নেয়া হয় তবে কেন ওহী বন্ধ হল? কুরআন অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হওয়ার অর্থ কি? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে মসজিদে নববীতে কেন নামায পড়ান না। (খুতবাতে সফদর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২) সফদর সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমানিত হচ্ছে লা-মাযহাবীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইমামতি না করাকে হায়তুন নাবীর বিরোদ্ধে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। যেমনটি কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম ইমামতি না করাকে জানাযায় উপস্থিত না হওয়ার যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। আউলিয়াদের জানাযার সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমতুল্লাহি আলাইহি انباء الاذكياء بحياة الانبياء কিতাবে ما من احد يسلم علي الا رد الله روحي এই হাদীসে রূহকে ফিরিয়ে দেয়ার অনেকগুলো ব্যাখ্যার একটিতে বলেন-

ويخرج من هذا جواب آخر وهو أن المراد برد الروح التفرغ من الشغل وفراغ البال مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال أمته والاستغفار لهم من السيئات ، والدعاء بكشف البلاء عنهم ، والتردد في أقطار الأرض لحلول البركة فيها ، وحضور جنازة من مات من صالح أمته ، فإن هذه الأمور من جملة أشغاله في البرزخ كما وردت بذلك الأحاديث والآثار– (انباء الاذكياء في حياة الانبياء)

অনুবাদ: এ থেকে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়, আর তা হল, রূহকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলমে বরযখে যে সকল বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তা থেকে বিরত থাকা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বরযখে যে সকল বিষয় নিয়ে মশগুল থাকেন সেগুলো হচ্ছে, (১) উম্মতের আমলসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা, (২) তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের উপর থেকে বালা-মুছিবত দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা, (৪) পৃথিবীর দিক-দিগন্তে যাতে কল্যাণ অবতীর্ণ হয় সে জন্য সে সকল স্থানে বারবার গমন করা ও (৫) তার উম্মতের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জানাযায় উপস্থিত হওয়া। আর এসবগুলোই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলমে বরযখের কার্যাবলী। এগুলোর স্বপক্ষে অনেক হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে। (আল হাওয়ী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

সুয়ূতী (র.) এর বক্তব্য থেকে প্রমানিত হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরযখী জীবনে সৎকর্মশীলদের জানাযায় শরীক হওয়াও একটি কাজ। আমাদের প্রশ্ন হলো কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তির জানাযার নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতির ব্যপারে কেউ যদি স্বপ্ন অথবা কাশফের মাধ্যমে জানতে পারেন আর তা উক্ত সৎকর্মশীল ব্যক্তির কারামত হিসাবে বর্ণনা করা হয়, তবে কি কোন দেওবন্দি আলিম গায়র মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের সুরে বলতে পারেন উক্ত জানাযা কেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ালেন না? এটা গায়র মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের ভ্রষ্টতার অনুসরণ নয় কি?

এসব অজ্ঞ নামধারী আলিমদের স্বরণ রাখা উচিৎ শেখ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম দিয়েছেন, 'আরওয়াহে সালাসাহ' তিনি উক্ত কিতাবে ব্রিটিশ শাসন আমলে কাসিম নানতুবি সাহেবের উপর ব্রিটিশ শাসকদের নজরদারীরর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নানতুবি

সাহেবের যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন তার কিছু অংশ নিম্নে পেশ করা হলো। হযরত নানতুবি সাহেব বলেন, আমি (এ পরিস্থিতিতে) অধিকাংশ সময় দেখতে পেতাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন এবং তাঁর চাদরে আমকে কোন সময় ঢেকে রেখেছেন, আবার কখনো বাইরে রাখছেন। প্রায় সময় স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় এ দৃশ্য আমি দেখতাম। (আরওয়াহে সালাসাহ, পৃষ্ঠা: ২২৯)

কাসিম নানতুবি সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেওবন্দ মাদরাসায় এসেছেন। এতে তাঁর রাওযা শরীফ খালি হয়নি। আর নানতুবি সাহেবও সাহাবী হননি। কারণ বরযখী জীবনের হুকুম দুনিয়াবী জীবন থেকে আলাদা।

কবরের নিকট ফাতিহা পড়ার উপকারিতা

কবরের পাশে তিলাওয়াতের বৈধতা সম্পর্কে আমার লিখিত 'সত্যনিষ্ঠ্যাদের দলীল-২' বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের 'মালফুযাত' থেকে উল্লেখ করছি। থানবী সাহেবের বক্তব্যগুলি তারতিব দিয়েছেন মাওলানা উসমান সাহেব। কিতাবটির নাম দিয়েছেন, 'মালফুযাতে কামালাতে আশরাফিয়া'। উক্ত কিতাবে উল্লেখিত বক্তব্যটি নিম্নে পেশ করা হলো-

قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی مصلحتیں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں کیا مصلحت ہے جہاں سے چاہے ثواب پہنچا سکتا ہے فرمایا کہ اس میں تین مصلحتیں ہیں ایک تو یہ کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے علاوہ ایصال ثواب کے خود پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں استحضار موت کا زیادہ ہوتا ہے دوسرے باطنی مصلحت یہ ہے کہ مردہ کو ذکر سے انس ہوتا ہے خواہ آہستہ آہستہ پڑھا جاوے یا زور سے حق تعالیٰ مردہ کو آواز پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بات اولیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمان بھی سنتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد روح میں بہ نسبت حیات کے کسی قدر ایک اطلاق کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے مگر نہ اتنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے۔ تیسرے یہ بھی ہے کہ ذکر کے انوار جو پھیلتے ہیں اس سے بھی مردہ کو راحت پہنچتی ہے۔

অনুবাদ: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছেন কবরের নিকট গিয়ে ফাতিহা পড়ার মধ্যে উপকারিতা কি? যে কোন স্থান থেকেই তো সওয়াব পৌঁছানো যায়। জবাবে আশরাফ আলী থানবী বলেন এর মধ্যে তিনটি উপকারিতা রয়েছে-

১. কবরের নিকট গিয়ে ফাতিহা পড়ার মধ্যে ঈসালে সাওয়াবের বাইরে তিলাওয়াতকারীর এই ফায়দা হয় যে, মৃত্যুর কথা তার বেশি মনে হয়।

২. দ্বিতীয় বাতিনী উপকারিতা হলো যিকর তথা তিলাওয়াতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির প্রশান্তি লাভ হয়। আস্তে আস্তে পড়া হোক অথবা উচ্চস্বরে পড়া হোক, আল্লাহ তাআলা মৃত ব্যক্তির নিকট আওয়াজ পৌঁছে দেন। এ বিষয়টি কেবল আউলিয়ায়ে কিরামের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং সাধরণ মানুষও শুনে থাকেন। কেননা মৃত্যুর পর রূহের মধ্যে একধরণের জীবনী শক্তি সৃষ্টি হয় এবং এর ক্ষমতা বেড়ে যায়। তবে এতটুকু নয় যে, কেউ থাকে হাজির নাজির মনে করবে।

৩. তৃতীয় উপকারিতা এটিও যে, তিলাওয়াতের যে নূর বিস্তার লাভ করে তাতে মৃত ব্যক্তির প্রশান্তি অর্জিত হয়। (মালফুযাতে কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা: ২৫৫)

সৎ কর্মশীলদের কবরের পাশে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে দু'আ কবুল হয়

ইমাম জাজরি (র.) (জন্ম:৭৫১ হিজরি, মৃত্যু: ৮৩৩ হিজরি) তার লিখিত হিসনে হাসিন কিতাবে فصل في أماكن الاجابة (দুআ কবুল হওয়ার পরিচ্ছেদ) নামে একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সৎ কর্মশীলদের কবরের পাশে দুআ কবুল হওয়া সম্পর্কে লিখেছেন

وعند قبور الانبياء عليه السلام ولا يصح قبر نبي بعينه سوي قبر نبينا صلي الله عليه وسلم بالاجماع فقط، وقبر ابراهيم عليه السلام داخل السور من غير تعيين– وجرب إستجابة الدعاء عند قبور الصالحين بشروط معروفه

অনুবাদ: নবীগণের বকরের পাশে (দু'আ কবুল হয়)। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফ ছাড়া আর কোন নবীর কবরের হুবহু স্থান ইজমা দ্বারা নির্ধারিত নয়। হযরত ইবরাহিম (আ.) এ কবর দেয়ালের ভেতরে। হুবহু স্থান চিহ্নিত নয়। **অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত হয় সৎ কর্মশীলদের কবরের পাশে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে দুআ কবুল হয়।** (হিসনে হাসীন)। আল্লামা শাওকানী (র) (জন্ম: ১১৭৩ হিজরি, মৃত্যু: ১২৫৫ হিজরি)

হিসনে হাসিনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুয যাকিরিন' কিতাবে উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركة وقد قدمنا أنها تسري بركة المكان على الداعي كما تسري بركة الصالحين الذاكرين الله سبحانه على من دخل فيهم ممن ليس هو منهم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

অনুবাদ: দু'আ কবুল হওয়ার কারণ উক্ত স্থানে অধিক মর্যাদা ও বরকত নাযিল হওয়া, যা আমি আগে বর্ণনা করেছি। বরকতময় স্থানের বরকত দু'আকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করে যেমনিভাবে সৎকর্মশীল ও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার যিকরকারীদের বরকত যিকরকারী নয় এমন মানুষের উপর পতিত হয়। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তারা এমন এক দল যাদের সংঙ্গে অবস্থানকারীরা হতভাগ্য হয় না। (তুহফাতুয যাকিরিন পৃষ্ঠা: ৬৩)

উল্লেখ্য: মকতাবাতে থানবী দেওবন্দ, ইউপি থেকে প্রকাশিত হিসনে হাসিন কিতাবের অনুবাদ গ্রন্থে 'সৎকর্মশীলদের কবরের পাশে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে দুআ কবুল হয়'- এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ আল্লামা শাওকানী যাকে আহলে হাদিস-সালাফিগণ তাদের ইমাম মনে করে থাকেন- তিনি সৎকর্মশীলদের কবরের পাশে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে দু'আ কবুল হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। মাকতাবতে আশরফির এধরণের কাটছাট করা রহস্যজনক নয় কি?

মর্ম উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

আহলে হাদীস লা-মাযহাবীগণ কোন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন না করে সরাসরি হাদীসের উপর আমল করাকে আহলে হাদীস হওয়ার মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এ কারণে তারা অনেক সময় নাপাক পানি দ্বারা ওযু করাকে জায়িয মনে করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বুখারী শরীফের একটি হাদীস ও তার ব্যখ্যা নিম্নে পেশ করা হল-

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ

الْآخِرُونَ لسَّابِقُونَ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং পরে সে উহাতে গোসল করে। (বুখারী)

হাদীসের শাব্দিক অনুবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি পানিতে পেশাব করে কেবল সে ই এ পানিতে গোসল করতে পারবে না। তবে অন্যরা তা দিয়ে ওযু গোসল করতে পারবেন। আহলে হাদীসের আস্থাভাজন ইমাম ইবনে হযম যাহিরীও অনুরূপ ফতওয়া প্রদান করেছেন। তাহলে আহলে হাদীসগণ অন্যান্য ব্যক্তির পেশাব করা পানিতে কি ওযু গোসল করবেন? পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সিদ্বান্ত হল যে কোন ধরনের পেশাব মিশ্রিত পানি যা পানির তিনটি গুণ হতে কোন একটি পরিবর্তন করে দেয়, তা দিয়ে ওযু গোসল জায়িয নেই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে আরেকটি হাদীস পেশ করছি।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْحِيَضُ وَالنَّتْنُ فَقَالَ « الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ »

অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা কি 'বুদা'আ কুপের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? অথচ উহা এমন একটি কুপ যাতে হায়েযের নেকড়া, মরা কুকুর ও পুঁতি গন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি পাক। কোন কিছুই উহাকে নাপাক করতে পারে না। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

আহলে হাদীস লা-মাযহাবীগণ বলে থাকেন, সহীহ হাদীস পেলেই তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই তার উপর আমল করতে হবে। তাহলে তারা কি পানিতে যতই নাপাকি থাকুক না কেন, তা দ্বারা ওযু গোসল জায়িয বলে থাকবেন?

আসহাবে যাওয়াহির এর কেরেশমা

আহলে হাদীস সালাফিগণ আসহাবে যাওয়াহিরের অনুসারী। প্রত্যেকটি মাসআলায় তারা আসহাবে যাওয়াহিরের অনুসরণ করে থাকেন। তাদের দাবী হলো কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সরাসরি তার ভাষ্যের উপর আমল করতে হবে। আসহাবে যাওয়াহির বুখারী শরীফের একটি হদীসের উপর আমল করতে গিয়ে পেশাব পায়খানা মিশ্রিত পানিতে অযু গোসল বৈধ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেছেন। প্রথমে আমরা বুখারী শরীফের হাদীসটি উল্লেখ করে তাদের বক্তব্য তুলে ধরছি। لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه-

অনুবাদঃ তোমাদের কেউ যেন স্থির যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (পেশাব করে) অতপর সে আবার তাতে গোসল করবে। (বুখারী)

উপরোক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে আহলে হাদীস সালাফিদের ইমাম হাফিয ইবনে হজম জাহিরী তার আল মুহাল্লা' কিতাবে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অনোয়ারুল বারী থেকে নিম্নে পেশ করা হলো-

হাফিয ইবনে হজম হাদীসটি থেকে মর্ম উদঘাটন করেছেন পানিতে কেবল পেশাব পতিত হলে অযু গোসল নিষেধ। যদি কেউ পানিতে পায়খানা করে তবে কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া যে পানিতে পেশাব করল কেবল সেই অযু করতে পারবে না। পেশাবকারী ছাড়া অন্য কেউ যদি অযু গোসল করে তবে কোন অসুবিধা নেই। পানিতে পেশাব না করে অন্যত্র পেশাব করার পর পেশাব যদি পানিতে পড়ে তবে পেশাবকারী এই পানি দিয়ে অযু গোসল করতে পারবে। যখন হাফিয ইবনে হজমকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো পেশাব পড়লে নাপাক হবে আর পায়খানা পড়লে নাপাক হবে না এ ধরনের পার্থক্য আপনার পূর্বে কি কেউ করেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই করেছেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাবকারীর কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু মলত্যাগকারীর কথা বলেন নাই। এ ব্যাপারে তিনি নীরব ছিলেন। যদি পায়খানার হুকুম পেশাবের মত হতো তবে এটা বর্ণনা করতে কি অসুবিধা ছিল? (আনোয়ারুল বারী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৫; ইবনে হজম জাহিরীর আল মহল্লার ১ম খন্ড,১৫৯ পৃষ্ঠা দেখে নিতে পারেন)

আহলে হাদীস আলিমগণের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা মানুষকে বুঝাচ্ছেন সহীহ হাদীস পেলেই তার উপর আমল করতে হবে। এতে কি ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে তা একটু চিন্তা করুন।

খালি মাথায় নামায পড়ার ব্যাপারে নাসির উদ্দীন আলবানীর ফতোয়া

লা-মাযবাহী, সালাফী ও আহলে হাদীসগণ টুপি ছাড়া খালি মাথায় নিয়মিত নামায পড়াকে জরুরী মনে করে থাকেন। অথচ তাদের আস্থাভাজন ইমাম ও শায়খুল ইসলাম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার ফতোয়ার মধ্যে টুপি ছাড়া খালি মাথায় নামায পড়াকে বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও মাকরূহ উল্লেখ করেছেন এবং এ কাজকে কাফিরদের সাথে মেলামেশার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কাফিরদের থেকে সংক্রমিত অপ-সংস্কৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। খালি মাথায় নামায পড়া সম্পর্কে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর ফতোয়া নিম্নরূপ

السؤال: ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس؟

الجواب: الذي أعتقده الكراهة؛ لأمور منها: أولاً: لأن كشف الرأس هو -أيضاً- من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب ممارسة الكافرين لها في بلادنا، وهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها، وتأثر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة، فعادة حسر الرأس في سوريا والأردن ومصر أكثر بكثير من البلاد العربية الأخرى، ك السعودية واليمن والكويت إلخ، فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسن زينة؛ لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:٣١] والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة، لكن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب.وثانياً: قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد، فإن الله أحق أن يتزين له) ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة، في الوقت الذي سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: (أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال عليه

الصلاة والسلام: أوكلكم يجد ثوبين؟) هذا الحديث يفيد جواز الصلاة في ثوب واحد، وهو الإزار الذي يستر العورة، لكن أيضاً يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد، مقتصراً بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة؛ بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة إذا صح تعبيري، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوف المنكبين فصلاته باطلة، وهذا حق ندين الله به، لهذا الحديث الصحيح: (لا يصلين أحدكم - نهي عن الصلاة- وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) وإذا ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر؛ فحينئذٍ نعتقد أن الصلاة بحسر الرأس مكروهة، لا لأن هناك نهياً خاصاً، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون.ويعجبني بهذه المناسبة وهو نهاية الجواب، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها، ذكر هناك رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافعاً يصلي حاسر الرأس، فقال له: [أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا، قال: فالله أحق أن يتزين له]

الكتاب : دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١٤٢٠هـ)

অনুবাদ: প্রশ্ন: খালি মাথায় নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর: আমার আকীদা হলো খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ এবং তা কয়েকটি কারণে। প্রথম কারণ হলো- মাথা অনাবৃত রাখা ঐ সমস্ত অভ্যাস ও অনুকরণসমূহের অন্তর্গত, যা কাফিরদের থেকে এবং কাফিরদের অনুকরনের কারণে মুসলিম দেশসমুহে সংক্রমিত হয়েছে। কাফিররা তাদের অভ্যাস ও রীতিসমূহ মুসলমানদের অঞ্চলে প্রচার করেছে। আর ঐসব অঞ্চলের মুসলমানেরা তাতে প্রভাবিত হয়েছে এবং কাফেররা চলে যাওয়ার পরেও তা আপন করে রেখেছে। মাথা অনাবৃত রাখাও ঐসবের মধ্যে একটি। যদিও এক্ষেত্রে মুসলিম অঞ্চলভেদে তারতম্য রয়েছে। মাথা অনাবৃত রাখার প্রবণতা সৌদি, ইয়ামান, কুয়েতসহ অন্যান্য আরব দেশসমূহ থেকে সিরিয়া, মিশর ও

জর্ডানে তুলনামূলকভাবে বেশী। যেহেতু মাথা অনাবৃত রাখা ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয় সেহেতু মুসলমান সর্বোচ্চ সৌন্দর্যে সজ্জিত হয়েই নামাযে প্রবেশ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:৩১] হে বনী আদম! তোমরা যখনই মসজিদে আস, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসো। (সূরা আ'রাফ-৩১) এ আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে যদিও এখানে সুন্দর পোশাকে আবৃত হওয়া বলতে সতর আবৃত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু শরয়ী বিধি-বিধানে দ্বারা ব্যাপকতাই উদ্দেশ্য হয়। দ্বিতীয়ত: সহীহ হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, : (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد، فإن الله أحق أن يتزين له) 'যার লুঙ্গি ও চাদর আছে, সে যেন লুঙ্গি ও চাদর পড়ে নামায আদায় করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অধিক হক্বদার যে, তার জন্য সৌন্দর্য অবলম্বন করা হবে।' এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে- মুসলিমগণ নামাযে পরিপূর্ণ পোশাক পরতে নির্দেশিত। সাথে হাদীসটি আগের আয়াতের ব্যাপকতার সম্ভাবনাকেও প্রবল করে দেয়। অন্য এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো- কোন পুরুষের জন্য কি এক কাপড়ে নামায পড়া জায়িয আছে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দুই কাপড়ের সামর্থ আছে? এ হাদীস, সতর আবৃত করে এমন এক পোশাকে নামায আদায়ের বৈধতা প্রদান করে। কিন্তু সাথে সাথে এ দিক নির্দেশনাও প্রদান করে যে, দুই কাপড়ের সামর্থবানদের জন্য এমন এক কাপড়ে নামায আদায় করা অনুচিত, যা শুধু আবশ্যকীয় সতরকেই আবৃত করে। বরং তার উপর আবশ্যক হলো- নামাযকালীন পূর্ণ সতরকেই আবৃত করা। আমার এ ব্যাখ্যার ভিত্তি হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস 'তোমাদের কেউ যেন এমন অবস্থায় নামায আদায় না করে যে তার কাঁধের উপর কাপড় নেই।' এ কারণে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কাঁধ অনাবৃত রেখে নামায আদায় করে তার নামায বাতিল। আমার দৃষ্টিতে উক্ত হাদীসের আলোকে এটাই সঠিক।

এতক্ষণের আলোচনার নিরিখে 'আয়াতে যীনাতে'র অধীনে নামাযও অন্তর্ভুক্ত হওয়া যখন প্রমাণিত হলো এবং একথাও প্রমাণিত হলো যে, মাথা আবৃত রাখাই মুসলমানদের সংস্কৃতি, অনাবৃত রাখা নয়। তো আমার আকীদা হলো- খালি মাথায় নামায আদায় করা মাকরূহ। এ কারণে নয় যে, খালি মাথায় নামায আদায়ের ব্যাপারে স্বতন্ত্র কোন নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বরং খালি মাথায়

নামায আদায় করা মুসলমানদের অবলম্বিত সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ। এ ব্যাপারে একটি হাদীস আমাকে যথেষ্ট আস্থাবান করেছে এবং যা এক্ষেত্রে চূড়ান্ত জবাব। হাদীসটি হলো 'একদা ইবনে উমর (রা.) তার গোলাম নাফে'কে খালি মাথায় নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি যদি ঐসব সম্ভ্রান্ত লোকদের নিকট গমন করতে, তাহলে কি তুমি এভাবে খালি মাথায় গমন করতে? নাফে (রা.) বললেন, না যেতাম না। তখন ইবনে উমর (রা.) বললেন- তাহলে আল্লাহ অধিক হক্বদার যে, তার জন্য সৌন্দর্য অবলম্বন করা হবে।' হাদীসটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (র.) 'হিজাবুল মারআহ ওয়া লিবাসুহা ফিস সালাত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। খুবই ছোট রিসালাহ। তোমরা হয়তো রিসালাটি সম্পর্কে জেনে থাকবে। (দুরুসুন লিশ-শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী।)

উপরোক্ত ফতোয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে,

১. খালি মাথায় নামায পড়া কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে মাকরুহ।

২. কাফিরদের দ্বারা মুসলিম দেশগুলি দীর্ঘদিন শাসিত হওয়ার কারণেই মুসলমানদের মাঝে কাফিরদের এ সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছে।

৩. এ সংস্কৃতি (খালি মাথায় নামায পড়া) চালু করার জন্য কাফিররা একদল মুসলমানকে ব্যবহার করেছে।

র‍্যালির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ

অনেক জায়িয কাজ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত না হওয়া সত্ত্বেও তা অনেক গুরুত্বপুর্ণ। যেমন মাদরাসাসমূহে সিলেবাস প্রনয়ন করে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা পালন করা হয়। এতে লা-মাযহাবী ওয়াহাবীসহ কারো কোন দ্বিমত নেই। সিলেবাস প্রনয়নের এ পদ্বতি কুরআন হাদীসে সরাসরি নেই। বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন উপলক্ষে ও জাতীয় দিবস সমূহে যেমন- শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি দিনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে থাকেন। ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে তাবলীগ জামাতের লোকেরা সকাল বিকাল তাসবীহ পাঠ করতে করতে রাস্তার পাশ দিয়ে যান। এটাও এক ধরনের র‍্যালি। যাকে তারা নাম দিয়েছেন গাশ্‌ত। এমনিভাবে অনেক সংগঠন রবিউল আউয়াল উপলক্ষে না'তে রাসূল ইত্যাদি পাঠ করে সারিবদ্ধভাবে র‍্যালি করে থাকেন। এটা সুন্নাত না হলেও প্রশংসনীয়। কারণ অনেক কাজ সুন্নাত নয়; অথচ

প্রশংসনীয়, এটা দেওবন্দীরাও স্বীকার করেন। বিস্তারিত জানতে হলে এই বই এর ''তাবলীগি চিল্লা কি বিদআত নয়?'' অধ্যয়টি দেখুন।

মুমিনগণ কোন কারণে আনন্দিত হলে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে র‍্যালির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ ও ঈমানী জযবা প্রদর্শনের একটি মযবুত ভিত্তি নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে রয়েছে। সীরতে হালাবী, তারীখুল খুলাফা, হুলিয়্যাতুল আউলিয়া, ফতহুল বারী, তারীখে দামেশক, মিরকাত, আল-ইয়াওয়াকীতসহ অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবে হযরত উমর (রা.) এর ফারূক উপাধি লাভের ঘটনা বর্ণিত আছে। সকল কিতাবের মর্ম একই হওয়ায় আমরা কেবল মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট অতি নির্ভরযোগ্য হাফিয ইবনে জাওযীর 'সিফাতুস সাফওয়াহ' কিতাব থেকে ঘটনাটি অনুবাদসহ এবং অন্যান্য কিতাবের বক্তব্য অনুবাদ ছাড়া উল্লেখ করছি।

وعن ابن عباس قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت الله لا اله إلا هو له الأسماء الحسنى فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله. صلى الله عليه وسلم فقلت أين رسول الله فقالت أختي هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله. صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة مالكم قالوا عمر بن الخطاب.قال فخرج رسول الله. صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم هزه هزة فما تمالك أن وقع على ركبته فقال ما أنت بمنته يا عمر قال قلت أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد قال فقلت يا رسول الله السنا على الحق أن متنا وان حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وان حييتم فقلت ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش والى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله. صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق.

অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত উমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে কেন ফারুক উপাধি দেয়া হয়েছিল?

তিনি বলেন, আমার তিন দিন পূর্বে হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর আল্লাহ ইসলামের জন্য আমার অন্তর খুলে দেন। আমি বললাম, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তার চেয়ে আর কোন প্রাণি আমার কাছে এত প্রিয় ছিলেন না। আমি বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায়? আমার বোন বললেন, তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী আরকাম বিন আবু আরকাম এর বাড়িতে আছেন। আমি সে বাড়িতে এলাম। বাড়িতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে হামযা (রা.)ও ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের ভেতর ছিলেন। আমি দরজার কড়া নাড়লাম। লোকেরা সবাই জমা হয়ে গেলেন। হামযা (রা.) বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললেন, উমর এসেছেন। এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে এলেন এবং উমর এর কাপড়ের অংশ ধরে টান দিলেন। তিনি তাঁর হাটুর উপর পড়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উমর! তুমি কি চাও? আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। ইহা শুনে ঘরের লোকজন উচ্চ স্বরে তাকবীর দিয়ে উঠলেন যার আওয়ায মসজিদে থাকা লোকেরাও শুনতে পেলেন। উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি জীবন মরণ সব সময় সত্যের উপর নই? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমাদের জীবন মরণ সব সময় সত্যের উপর আছো। আমি বললাম, তাহলে গোপনীয়তা কেন? যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমরা বের হব। **এর পর আমারা সারিবদ্ধ হয়ে দু' সারিতে বের হলাম। এক সারিতে হামযা (রা.) আর অন্য সারিতে আমি। আমরা দ্রুত গতিতে হেঁটে মসজিদে প্রবেশ করলাম।** উমর (রা.) বলেন, আমি কুরাইশদের দিকে তাকালাম, আর হামযা (রা.) এর দিকে তাকালাম। দেখলাম, তারা খুবই কষ্ট পাচ্ছে। এমন কষ্ট তারা আর কোনদিন পায়নি। এদিনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ফারূক উপাধি প্রদান করেন। (সাফওয়াতুস সাফওয়াহ: ইবনুল জাওযী)

জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (র.) এর লিখিত 'তারীখুল খুলাফা' কিতাবের ভাষ্য নিম্নরূপ-

قال: فتعظمت في صدري وقلت: من هذا فرت قريش فأسلمت وقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فإنه في دار الأرقم فأتيت الدار فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة مالكم قالوا عمر قال: وإن كان عمر افتحوا له الباب فإن أقبل قبلنا منه وإن أدبر قتلناه فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فتشهد عمر فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل مكة قلت يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى قلت: ففيم الإخفاء؟ فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق– .(فصل في الأخبار الواردة في إسلامه)

'সীরতে হলবী'র ভাষ্য নিম্নরূপ-

والذي بعثك بالحق لنخرجن، فخرجنا في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له: أي لذلك الجمع كديد ككديد الطحين أي لذلك الجمع غبار ثائر من الأرض لشدة وطء الأقدام، لأن الكديد التراب الناعم إذا وطيء ثار غباره قال: حتى دخلنا المسجد، فنظرت قريش إليّ وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها: أي فطاف بالبيت وصلى الظهر معلناً ثم رجع ومن معه إلى دار الأرقم، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ الفاروق

ফতহুল বারীর 'ফাযাঈলে আসহাবে নবী' অধ্যায়ে ইবনে হজর আসকালানী (র.) লেখেন-

روى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث بن عباس وفي اخره فقلت يا رسول الله ففيم الاختفاء فخرجنا في صفين انا في أحدهما وحمزة في الاخر فنظرت قريش إلينا فاصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها– (باب فضائل اصحاب النبي)

মুল্লা আলী কারী (র.) মানাকিবে উমর (রা.) অধ্যায়ে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন-

بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وان حييتم فقلت ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن فاخرجنا صلى الله عليه وسلم في صفين حمزة في أحدهما وأنا

في الآخر ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق فرق الله بي بين الحق والباطل– (مرقاة: باب مناقب عمر)

আবু ইউসূফ মুহাম্মদ যায়েদ اليواقيت العشرية من كلام خير البرية - কিতাবে ঘটনাটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন-

والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وان حييتم فقلت ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش والى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله. صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق.

حلية الأولياء কিতাবে আবু নু'আইম আল ইসবাহানী লেখেন-

والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم، قال: فقلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فاخرجناه في صفين حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق. وفرق الله بين الحق والباطل– (باب عنر بن الخطاب).

ইবনে 'আসাকির 'তারীখে দামেশক' কিতাবে উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহন অধ্যায়ে ঘটনাটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন-

بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم قال فقلنا ففيم الإختفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وإنا في الآخر له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يومئذ الفاروق وفرق بين الحق والباطل–(باب عمر رضي الله عنه)

শুভ সংবাদের আনন্দ প্রকাশের আরেকটি প্রমান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনে খুশি হয়ে সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন কর্মসূচী পলন করেছিলেন। তিনি যখন তাবুক থেকে ফিরে মদীনা শরীফ প্রবেশ করেন তখন মদীনার আনসারগণ খুশি হয়ে যে সকল কাজ করেছিলেন তা ইদ্রিস কান্দুলভী সাহেবের 'সীরাতে মুস্তফা' কিতাব থেকে নিম্নে উল্লেখ করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আসছিলেন নবুওতের এ পূর্ণচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বড় ছোট সকলে বাইরে বের হয়ে আসে। এমনকি পর্দানশীল মহিলারা পর্যন্ত ঘর দোর ছেড়ে রাস্তায় ও ময়দানে বের হয়ে আসে। ছোট ছোট মেয়েরা আনন্দের আতিশয্যে গাইতে থাকে-

طلع البدر علينا **من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا ** جئت بالأمر المطاع

যখন মদীনা শরীফের ঘর দোর নজরে আসতে লাগল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন. هذه طابة এই (এসে পড়েছে) পবিত্র নগরী। উহুদ পাহাড় নজরে এলে বললেন هذا أحد جبل يحبنا ونحبه এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। (শরহে মাওয়াহিব, সুত্র: সীরতে মুস্তফা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ তাশরীফ নেয়ার সময়কার ঘটনা সংক্রান্ত মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষের অংশ নিম্নরূপ-

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.(باب فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ وَيُقَالُ لَهُ حَدِيثُ الرَّحْلِ)

অনুবাদ: পুরুষ ও মহিলাগণ ঘরের ছাদে আরোহন করলেন। শিশু ও দাস দাসীরা রাস্তায় বের হয়ে এলেন এবং উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন- يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. (হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসূল!) (মুসলিম: বাব: فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় কাজী আয়ায (র.) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم কিতাবে লেখেন-

فيه ما كان اتى الله نبيه – عليه السلام – من المحبة فى القلوب ما خص الله به هذا الحى من الانصار ؛ لما أراده الله بهم من الخير ، وما قضاه من إظهار دينه على أيديهم . (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم – للقاضي عياض)

অনুবাদ: এতে রয়েছে আনসারদের অন্তরে আল্লাহ পাক যে মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার বহি:প্রকাশ। যেহেতু আল্লাহ তাদের মাধ্যমে রাসূলে পাকের কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। এবং তাদের মাধ্যমেই তাঁর দিনকে বিজয়ী করার সিদ্বান্ত নিয়েছেন।

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, আনসার সাহাবীগণ মুহব্বত প্রকাশের উদ্যেশ্যে يَا مُحَمَّدُ বলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান করে মুহব্বতের জজবা প্রদর্শন করেছিলেন।

আহলে হাদীসের আমীর ড. আসাদুল্লাহ গালিবের দৃষ্টিতে মওদুদী সাহেব বুখারীসহ অধিকাংশ সহীহ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যপারে সন্দিহান ছিলেন

মাওদুদী সাহেবের লিখিত বই পুস্তক পাঠ করলে বুঝা যায় যে, তিনি মাযহাব ও তাসাউফের বিরোধী ছিলেন। এজন্য তার দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ সমর্থকরা ধর্মীয় দর্শনের দিক থেকে আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদের সঙ্গে গভীরভাবে সর্ম্পকিত। আহলে হাদীস লা-মাযহাবীগণ ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করলেও কুরআন সুন্নাহর কথা বলে থাকেন। এব্যপারে মাওদুদী সাহেব ও তার অনুসারীদের কিছুটা স্বতন্ত্র চিন্তাধারা রয়েছে। সুন্নাহর উপর তাদের পুরাপুরি আস্থা না থাকার কারণে তারা কেবল কুরআনকেই সংবিধান বলে থাকেন। অথচ সংবিধান প্রণয়নে সুন্নাহর গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে তা কুরআনের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন- আমার রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো। এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা: হাশর, আয়াত নং: ০৭)

এ ধরনের চিন্তধারায় বিশ্বাসীদের সর্ম্পকে রাসূলে পাক সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করেছেন-

وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه . (رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبيهقي في (دلائل النبوة

অনুবাদ : আবু রাফে' (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানিনা। যা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাব, আমরা তারই অনুসরণ করব'।

(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত, আলবানী হা/১৬২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৫৪ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদের আমির ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখেন-

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যকার একদল লোক হাদীসকে অগ্রাহ্য করবে এবং, নিজেদেরকে শুধু কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করবে। এর অর্ন্তনিহিত কারণও উক্ত হাদীসে ইঙ্গিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঐসব লোকেরা হবে বিলাসী ও দুনিয়াদার। এরা হাদীসে বর্ণিত ইসলামের বিস্তারিত আদেশ ও নিষেধাবলীর পাবন্দী হ'তে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতা বহাল রাখার জন্য কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করবে। কারণ কুরআনে মূল বিষয়গুলিই মাত্র বর্ণিত হয়েছে, ব্যাখ্যা আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণের মাধ্যমে কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা পেশ করে গেছেন। এমনকি কুরআনে বর্ণিত হয়নি, এমন অনেক বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে, যা উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয়। কেননা কুরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসূল তোমাদের নিকটে যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (সূরা হাশর, আয়াত:৭)।

অথচ উক্ত লোকগুলি মুখে ও কলমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসাগীতি গাইলেও তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্য বিভিন্নভাবে চোরাপথ তালাশ করে। আর সে কারণে তারা হাদীসকে প্রকাশ্যে অথবা পরোক্ষে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। (হাদীসের প্রামানিকতা, পৃষ্ঠা: ০৫)

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন তো দেয়া হয়েছে, এর সাথে আরো অনেক বস্তু দেয়া হয়েছে, যাতে তাঁর অনুসরণ ওয়জিব। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিম্মাদারী প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন-

অনুবাদ: তিনি তাদেরকে আদেশ করেন নেক কাজের, এবং নিষেধ করেন বদকাজ হতে। আর তিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু। এবং হারাম করে দেন যাবতীয় অপবিত্র বস্তু। আর তিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খল হতে যা তাদের উপর ছিল। (সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭)

আয়াতটির 'يحل' শব্দটি যেহেতু আম বা সার্বজনীন, সেহেতু যা তিনি হালাল করেন ও হারাম করেন যার উৎস কুরআন (ওহী মাতলু) অথবা হাদীস (ওহী গায়র মাতলু) সবই এতে অন্তর্ভুক্ত। এ কথার প্রমান নিম্নোক্ত হাদীস-

الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه

অনুবাদ: জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমাকে দেয়া হয়েছে কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ একটি (ইলম) অর্থাৎ ওহী গায়র মাতলু। (আবু দাউদ)

মাওদুদী সাহেবের অনুসারী ও আহলে হাদীসগণ একই প্লাটফর্মে কাজ করেন এবং একই ধরণের আক্বিদা পোষন করে থাকেন। অথচ আহলে হাদীসের আমির ডা. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেব তার লিখিত হাদীসের প্রামানিকতা বইয়ে প্রমাণ করেছেন মাওদুদী সাহেব হাদীসের বিরাট একটা অংশের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। বিশেষ করে খবরে ওয়াহিদ যা হাদীসশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ অংশ, তা ধারণা নির্ভর বলে অস্বীকার করার পর্যায়ে পৌছে গেছেন। গালিব সাহেব বাংলাদেশী আহলে হাদীস ফিরকার একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ত্ব। তার বইটি সর্বত্র বিক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে। মাওদুদীর সাহেবের কোন অনুসারী এর সুষ্ট জবাবও দিচ্ছন না। বুখারী-মুসলিমসহ হাদীসের সকল কিতাব খবরে ওয়াহিদ দ্বারা (হাদীসের এক প্রকার)

ভরপুর। এই হিসাবে বলা যায় তারা সকলেই এ ব্যক্তব্য মেনে নিয়েছেন। আমরা নিম্নে ডা. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবের বক্তব্য তার 'হাদীসের প্রামানিকতা' বই থেকে তুলে ধরছি। বক্তব্যটি নিম্নরূপ:

'হাদীছ' সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর আক্বীদা

(عقيدة المودودي في الحديث)

হাদীছ ও হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর আক্বীদা লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'মাসলাকে এ'তেদাল' (مسلک اعتدال) নামক নিবন্ধে, যার বঙ্গানুবাদ 'সুষম মতবাদ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হাদীছকে 'যান্নী' (ظنى) বা 'ধারণা নির্ভর' বলে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। যদিও এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। তবুও অনেক ঘুরিয়ে তিনি যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা এই যে, হাদীছের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই। কেননা বর্ণনাকারী একজন মানুষ হিসাবে ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। অতএব এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ হ'ল ফক্বীহদের মর্ম অনুধাবন (تفقه) ও তাঁদের বিশেষ রুচিবোধ (خاص ذوق)। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণকে তিনি সাংবাদিক (اخبارى) দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলে মনে করেন, যারা কেবল সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করেন, কিন্তু এর তাৎপর্য (تفقه) অনুধাবন করেন না। যেমন তিনি বলেন,

محدثین رحمهم الله کی خدمات مسلم... کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیۃً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے، بہر حال تھے تو انسان ہی... پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟... مزید برآں ظن غالب ان کو جس بنا پر حاصل ہوتا تھا وہ بلحاظ روایت تھا نہ کہ بلحاظ درایت- ان کا نقطہ نظر زیادہ تر اخباری ہوتا تھا، فقہ ان کا اصل موضوع نہ تھا... یہ ماننا پڑیگا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انہوں نے کی ہے اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں، ایک بلحاظ اسناد اور دوسرے بلحاظ تفقہ-

'মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের খিদমত সর্বস্বীকৃত।.... এতে কোন কথা নেই। কথা কেবল এ বিষয়ে যে, পুরোপুরিভাবে তাঁদের উপরে ভরসা করা কতটুকু সঠিক হবে। হাযার হৌক তাঁরা তো ছিলেন মানুষই। ...অতএব কিভাবে আপনি একথা বলতে পারেন যে, তাঁরা যে হাদীছকে 'ছহীহ' সাব্যস্ত করেছেন, আসলেই সেটা ছহীহ। ...অধিকন্তু যার কারণে তাদের মধ্যে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটি হ'ল রেওয়ায়াতের (বর্ণনার) দৃষ্টিকোণ, দিরায়াতের (যুক্তি গ্রাহ্যতার) দৃষ্টিকোণ নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশীর বেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, ফিক্বহ বা তাৎপর্য অনুধাবন তাদের বিষয়বস্তু ছিল না। ...অতএব একথা মানতেই হবে যে, হাদীছসমূহে যেসব গবেষণা তাঁরা করেছেন, তাতে দু'টি দিকে তাঁদের দুর্বলতা ছিল। ১- সনদের দিক দিয়ে ২- মর্ম অনুধাবনের দিক দিয়ে।[২৭]

প্রিয় পাঠক! নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কত সুন্দরভাবে তিনি ফিক্বহকে হাদীছের উপরে স্থান দিতে চেয়েছেন। অথচ কে না জানে যে, হাদীছের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে স্থান-কাল পাত্র ভেদে মুজতাহিদ ফক্বীহগণের মধ্যে সকল যুগে মতভেদ হয়েছে। কিন্তু হাদীছের অথায় কোন পরিবর্তন হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ। অতএব হাদীছের বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাই করাই হ'ল মুখ্য। আর বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য বর্ণনাকারীকে যাচাই করা সর্বাধিক প্রয়োজন। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ তাই সনদ যাচাইয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আর একারণেই তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) বলেছেন, اَلْإِسْنَادُ عِنْدِيْ مِنَ الدِّيْنِ، لَوْلاَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ 'আমার নিকটে সনদ হ'ল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ যাচাই না হ'ত, তাহ'লে যে যা খুশি তাই বলত' (মুক্বাদ্দামা মুসলিম পৃঃ ১৫)। মুহাদ্দিছগণ সনদ যাচাইয়ের সাথে সাথে হাদীছের 'দিরায়াত' বা যুক্তিগ্রাহ্যতা সূক্ষ্মভাবে যাচাই করেছেন। উছূলে হাদীছের ছাত্রগণ তা ভালভাবেই জানেন। অতএব মাওলানার উপরোক্ত মন্তব্য হাদীছ বিরোধীদের উত্থাপিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। যদিও মাওলানা হাদীছ অস্বীকারকারী ছিলেন না।

---

২৭. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (দিল্লী: মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৭৯) ১/৩৩৬ পৃঃ।

তিনি আরো কিছু অগ্রসর হয়ে লিখেন

দুর্ভাগ্য এই যে, যুক্তিবাদের ধাঁধানো চোখে আমরা অনেক সময় অন্ধকার দেখি। ফলে সহজ চিন্তার স্নিগ্ধ আলোকে আমরা অহি-র বিধানের প্রকাশ্য রাস্তা খুঁজে পেতে অনেক সময় ব্যর্থ হই। যে জন্য মাওলানা মওদূদীর ন্যায় ইসলামের একজন সিপাহসালারের অতি যুক্তিবাদী চক্ষু এমনকি ছহীহ বুখারীর হাদীছসমূহের বিশুদ্ধতাও খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন তিনি বলেন,

کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہونچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ مثلاً بخاری، جسکے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنیوالا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو چھ سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔

'কোন শরীফ লোক এ কথা বলতে পারে না যে, হাদীছের যে সমষ্টি আমাদের নিকটে পৌঁছেছে, তার সবটা অকাট্যভাবেই ছহীহ। যেমন বুখারী, যাকে আল্লাহর কেতাবের পরে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কিতাব বলা হয়, হাদীছের

৩৬. আহমদ, বরযখী, ত্রিশমত ম/১৭৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর' অনুচ্ছেদ।

অতি বড় ভক্তও একথা বলতে পারে না যে, এর মধ্যে যে ছয়-সাত হাযার হাদীছ সংকলিত আছে, তার সবটাই ছহীহ'।[৩৭] কি তাচ্ছিল্যভরা ভয়ংকর মন্তব্য! অথচ এ প্রসঙ্গে ভারতগুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

أَمَّا الصَّحِيْحَانِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ صَحِيْحٌ بِالْقَطْعِ، وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفَيْهِمَا، وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يُهَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرِ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ- (حجة الله البالغة ١/١٣٤)-

'ছহীহায়েন অর্থাৎ ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, এ দু'য়ের মধ্যে মুত্তাছিল মা'রফূ' যত হাদীছ রয়েছে, সবই অকাট্যভাবে ছহীহ। যে ব্যক্তি ঐ দুই গ্রন্থ সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করবে, সে বিদ'আতী এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধী তরীকার অনুসারী'।[৩৮]

অথচ হাদীছের সনদ এবং বর্ণনাগত ও তাৎপর্যগত বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) -এর কঠোর শর্তাবলী এবং ফিক্বহ বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা কিংবদন্তীর ন্যায় প্রসিদ্ধ। হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যকারী ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ مَا قَبَضَ اللهُ تَعَالَى رُوْحَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَفَعَ الْوَحْيَ عَنْهُ حَتَّى أَغْنَي أُمَّتَهُ كُلَّهُمْ عَنِ الرَّأْيِ– 'যাঁর হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি এবং 'অহি' উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তাঁর উম্মত সকল প্রকার 'রায়' (তথা যুক্তিবাদ) হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে'।[৩৯] অতএব মুজতাহিদগণের 'রায়' নয়, বরং মুহাদ্দিছগণের গৃহীত ছহীহ হাদীছই হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড।

৩৭. যাওয়াবে' পৃঃ ১৪৫, গৃহীত : সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম লাহোর, ২৭ মে ও ৩ জুন ১৯৫৫।
৩৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ দারুত তুরাছ, ১৩৫৫ হিঃ) ১/১৩৪ পৃঃ।
৩৯. মীযান ১/৬২।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.)
(জন্মঃ ৮৪৯ হিজরী, ওফাতঃ ৯১১ হিজরী)

প্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম, যুগের মুজাদ্দিদ, ইমাম আবু হানিফা (র.) সহ ইমাম আইম্মা সূফীগণের উপর উত্থাপিত আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবদাতা, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারা শায়খুল হাদীস ওশায়খুস সুন্নাহ খেতাবপ্রাপ্ত, সত্তর এর অধিকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন লাভকারী, সুক্ষ বিশ্লেষক, বহুসংখ্যক মূল্যবান কিতাবের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.) মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতার ছায়া থেকে বঞ্চিত হন। পিতার অসিয়ত অনুযায়ী কতিপয় বুযুর্গের সান্নিধ্যে গমন করেন। যার মধ্যে শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফীও ছিলেন। তিনি তাকে ওয়াযিফায়ে শাইখুনিয়ার সবক প্রদান করেন এবং তার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ প্রদান করেন। মাত্র আট বছর বয়সে কুরআনুল কারীম মুখস্থ

করার পর অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবাদিও মুখস্থ করেন। শাইখ শামস সাইরামী ও শাইখ শামস মিরযুবানীর নিকট পাঠভুক্ত ও পাঠ বহির্ভূত অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেন। আল্লামা বুলকিনী, আল্লামা শারফ আল-মানাদিরী এবং মিশরের মুহাক্কিক সাইফুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হানাফী, আল্লামা শুমন্নি এবং আল্লামা কাফিজীর দরসের মজলিস থেকেও দীর্ঘদিন উপকৃত হন। মোটকথা, পরিপূর্ণরূপে জ্ঞানার্জনের পরেই লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করেন এবং পাঁচশর অধিক মূল্যবান কিতাব সংকলন করেন। অতি দ্রুত লিখতে পারতেন। স্বীয় যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমার দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ আছে। এরচেয়ে বেশী হাদীসের সন্ধান জানলে তাও মুখস্থ করে ফেলতাম।' চল্লিশ বছর বয়সে নিজেকে নির্জনে আবদ্ধ করে ফেলেন। নির্জনে বসে পাঠদান ও ফতোয়া প্রদান পরিহার করে কেবলমাত্র লেখালেখি ও ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত হন। দুনিয়াবী সকল সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন-

وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته، ويعرضون عليه الأموال النّفيسة فيردّها، وأهدى إليه الغوري خصيا وألف دينار، فردّ الألف، وأخذ الخصي، فأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية، وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا بهدية قط فإنّ الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك،وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه ورؤي النبيّ صلّى الله عليه وسلم في المنام، والشيخ السّيوطي يسأله عن بعض الأحاديث والنبيّ صلّى الله عليه وسلم يقول له: «هات يا شيخ الحديث» [1] . ورأى هو بنفسه هذه الرؤيا، والنبيّ صلّى الله عليه وسلم يقول له: «هات يا شيخ الحديث. «

وذكر الشيخ عبد القادر الشّاذلي في كتاب ترجمته أنه كان يقول: رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلم يقظة فقال لي: «يا شيخ الحديث» . فقلت له: يا رسول! الله أمن أهل الجنّة أنا؟ قال »نعم» ، فقلت: من غير عذاب يسبق. فقال: «لك ذلك وقال الشيخ عبد القادر: قلت له كم: رأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلم يقظة؟ فقال: بضعا وسبعين مرةi وذكر خادم الشيخ السيوطي محمد بن علي الحباك: أن الشيخ قال له يوما، وقت القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي بمصر بالقرافة: أتريد أن تصلي العصر بمكة بشرط أن تكتم ذلك عليّ حتى أموت. قال: فقلت: نعم قال:فأخذ بيدي

وقال غمّض عينيك فغمّضتهما فرمى [2] بي نحو سبع وعشرين خطوة ثم قال لي: افتح عينيك، فإذا نحن بباب المعلاة [3] فزرنا أمّنا خديجة والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، وغيرهم، ودخلت الحرم فطفنا وشربنا من ماء زمزم، وجلسنا خلف المقام، حتى صلينا العصر، وطفنا وشربنا من زمزم، ثم قال لي:يا فلان ليس العجب من طي الأرض لنا وإنما العجب من كون أحد من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا، ثم قال لي: إن شئت تمضي معي وإن شئت تقيم حتى يأتي الحاج قال فقلت: أذهب مع سيدي، فمشينا إلى باب المعلاة [3] وقال لي: غمّض عينيك، مضتهما، فهرول بي سبع خطوات. ثم قال لي افتح عينيك، فإذا نحن بالقرب من الجيوشي، فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض الكتاب: شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى 1089هـ

অনুবাদ: আমির ও ধনশালীরা তার সাক্ষাতের জন্য আগমন করত এবং হাদিয়া তুহফা পেশ করত কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। একবার সুলতান ঘুরী একটি পুরুষত্বহীন গোলাম ও একহাজার আশরাফী প্রদান করেন। গোলামটি গ্রহন করে আশরাফীগুলিকে ফেরত প্রদান করেন। আর গোলামটিকে আযাদ করে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মুবারকের সেবক নিয়োজিত করে দেন। আর সুলতানের দূতকে এ বার্তা প্রদান করেন যে, সুলতান যেন ভবিষ্যতে এ ধরণের হাদিয়া প্রদান না করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এধরণের উপহার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। সুলতান কয়েকবার তাকে ডেকে পাঠান কিন্তু তিনি তার সাক্ষাতের জন্য গমন করেননি। কেউ একজন স্বপ্ন দেখেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইয়া শায়খুল হাদীস' বলে সম্বোধন করেছেন। সুয়ুতী নিজেও স্বপ্নে দেখেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'ইয়া শাইখুল হাদীস' বলে সম্বোধন করছেন। শায়খ আব্দুল কাদির শাযুলী বলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাগ্রত অবস্থাতেই 'ইয়া শায়খুল হাদীস' বলে সম্বোধন করেন। (তিনি আরো যুক্ত করেন) আল্লামা সুয়ুতী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি জান্নাতী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন, হাঁ তুমি জান্নাতী। তিনি আবারো প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ধরণের আযাব ভোগ করা ছাড়াই? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, হাঁ তোমার ক্ষেত্রে তাই হবে। আব্দুল কাদির শাযুলী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কতবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জাগ্রত অবস্থায় সাক্ষাত করেছেন? তিনি বলেন, সত্তরের অধিকবার। তার বিশেষ খাদিম মুহাম্মদ বিন আলী হাব্বাক থেকে এরকম ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, একবার জালালুদ্দীন সুয়ূতী আমাকে দুপুরের বিশ্রামের সময় বললেন, তুমি যদি আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ বিষয়টি গোপন রাখতে পার, তাহলে আমি আজ তোমাকে আসর নামায আদায় করার জন্য কাবা শরীফে নিয়ে যেতে পারি। আমি বললাম অবশ্যই। তিনি আমার হাত ধরে বললেন চক্ষু বন্ধ কর। আমি চক্ষু বন্ধ করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে সাতাশ কদম অগ্রসর হয়ে বললেন, চক্ষু খোল। চোখ মেলে দেখতে পেলাম আমরা বাবুল মুয়াল্লায় পৌঁছে গেছি। সেখানে আম্মাজান হযরত খাদিজা (রা.) হযরত ফুযাইল বিন আয়ায এবং সুফয়ান বিন উয়াইনার যিয়ারত করলাম। অতঃপর হারাম শরীফে পৌঁছে তাওয়াফ করলাম, যমযমের পানি পান করলাম, মাকামে ইবরাহিমের পিছনে বসলাম, অতঃপর আসর নামায আদায় করলাম। এরপর আবারো তাওয়াফ করে যমযমের পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন যমিন আমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছে এটি কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় বরং এরচেয়েও বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো যে, মিশরের আমাদের প্রতিবেশীদের কেউই আমাদেরকে চিনতে পারেনি। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমার সাথে গমন করতে পার অথবা হাজী সাহেবদের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পার। আমি বললাম, আমি আমার শায়খের সাথেই গমন করব। অতঃপর আবার বাবুল মুয়াল্লায় আসলাম। তিনি আমার হাত ধরে চক্ষু বন্ধ করতে বললেন, আমি চক্ষু বন্ধ করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে সাত কদম অগ্রসর হলেন। চোখ খোলে দেখতে পেলাম যে, আমার মিশরের কারবে পৌঁছে গেছি। অতঃপর আমি আমার সাইয়্যিদ উমর বিন ফারিযের নিকট চলে আসলাম। (শাযরাতুয যাহাব)

হযরত জালালুদ্দীন সুয়ুতীর মানাকিব, ফযিলত ও সঠিক ভবিষ্যতবানীর ঘটনা অনেক। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কারামত হলো, তার সংকলিত কিতাবাদি। যার অধিকাংশই প্রসিদ্ধ ও সকলের জানা। বুসতানুল মুহাদ্দিসীনে উল্লেখ আছে তার (১) মুসালসালাতে সুগরা (২) জিয়াদুল মুসালসালাত এবং (৩) মুসালসালাতে কুবরার বর্ণনা পাওয়া যায় আর রিসালাতুল মুস্তাতরাফিয়্যাতে। যাতে ৮৫টি হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। (আনওয়ারুল বারী ২য় খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠায় শাযরাতুয যাহাব ৭ম খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠার বরাতে এনেছেন।)

খারিজিদের জাহিরি দ্বীনদারি, ভেতরে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারীদেরর প্রতি বিদ্বেষ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকলেও সালাফী ওয়াহাবীরা খারিজিদের অনুকরনে অনেক সাহাবীদের সমালোচনা করে থাকেন। অথচ বাহ্যিকভাবে তাদের পরহেজগারি দেখলে মনে হয় তারাই প্রকৃত মুসলমান। নিম্নে খারিজিদের জাহিরি দ্বীনদারি এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো-

১। হাফিয ইবনে কাসীর বলেন, কোন সফরকালে একটি গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়ে । একজন খারিজি তা উঠিয়ে নিয়ে মুখে দিল। অপর খারিজি এতে আপত্তি করল। সে বলল, তুমি মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং মূল্য পরিশোধ না করে এই খেজুরটি কেন মুখে দিলে? সাথে সাথে লোকটি মুখ থেকে তা ফেলে দিল। (ইবনে আসীরঃ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খণ্ডঃ৭, পৃষ্ঠাঃ২৮৮)

২। অনুরূপ ইমাম ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন, একদা খারিজিদের নিকট দিয়ে অমুসলিম শহরবাসীদের একটি শুকর যাচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন খারিজি শুকরটি তলোয়ার দিয়ে মেরে ফেলে। এতে অপর খারিজিরা তাকে কঠোর গালমন্দ করে। এক অমুসলিম শহরবাসীর শুকর তুমি কেন মেরে ফেললে? শুকরটির মালিক এলে খারিজি লোকটি তার নিকট ক্ষমা চায় আর তাকে শুকরটির মূল্য পরিশোধ করতঃ সন্তুষ্ট করে। (ইবনে আসীরঃ আল কামিল ফীত তারিখ, খণ্ডঃ৩, পৃষ্ঠাঃ২১৮)

এক দিকে খারিজিদের জাহিরি দ্বীনদারি; অপর দিকে দেখুন তাদের সন্ত্রসবাদী কর্মকান্ড, নৃশংসতা ও তাদের বর্বর পৈশাচিকতা। হাফিয ইবনে কাসীর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আরও লিখেছেন, তারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.) কে নদীর কিনারায় নিয়ে গেল আর জবাই করে দিল। এরপর তাঁর স্ত্রীর নিকট গেল। তিনি বললেন, আমি একজন অন্তঃস্বত্তা রমণী। তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? তারা তাঁকেও জবাই করে দিল আর তাঁর পেট কেটে বাচ্চাটি বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলল। (ইবনে আসীরঃ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খণ্ডঃ৭, পৃষ্ঠাঃ২৮৮)

হানফী মাযহাবের বিশ্ব বিখ্যাত ফতওয়ার কিতাব ফতওয়ায়ে শামী'তে সুন্নী মুসলমানদের প্রতি ওয়াহাবীদের অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি সাহেব তার লিখিত 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে খারিজিদের দ্বারা প্রভাবিত ওয়াহাবিদের সুন্নি মুসলমানদের সাথে আচরনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নে পেশ করা হল। মাদানী সাহেব ওয়াহাবীদের সম্পর্কে লেখেন-

صاحبو! محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداءً
تیرھویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا۔ اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے
اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا ان کے اموال کو
غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً
اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی
اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ
معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک
ظالم و باغی خونخوار فاسق شخص تھا۔ اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس سے اور اس کے اتباع سے دلی
بغض تھا اور ہے۔ اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے
غرضکہ وجوہات مذکورۃ الصدر کی وجہ سے ان کو اس کے طائفہ سے اعلیٰ درجہ کی عداوت ہے اور بیشک
جب اس نے ایسی ایسی تکالیف دی ہیں تو ضرور ہونا بھی چاہئے۔

অনুবাদঃ সুধিগণ. মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী সর্বপ্রথম আরবের নজদ থেকে ১৩০০ হিজরীতে আবির্ভুত হয়। যেহেতু সে বাতিল চিন্তাধারা এবং ভ্রষ্ট আকিদা পোষণ করত, এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীকে হত্যা করে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক তার বাতিল চিন্তাধারা সমর্থনের জন্য কষ্ট দিতে থাকে। তাদের মালকে গণিমতের মাল মনে করে। তাদেরকে হত্যা করা সওয়াব ও রহমতের কারণ মনে করে। বিশেষ করে হারামাইনের অধিবাসীকে এবং সাধারণভাবে হেজাযবাসীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সালফে সালিহীন এবং তাদের অনুসারী সর্ম্পকে অত্যন্ত বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে। অনেক লোককে তাদের এসব আচরণের কারণে মক্কা মদিনা ত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া হাজার হাজার মানুষ তাদের বাহিনীর হাতে নিহত হয়। মোটকথা, সে একজন জালিম, বাগী এবং রক্ত পিপাসু ফাসিক ছিল। এজন্য বিশেষত আরবের অধিবাসীগণ তার ও তার অনুসারীদের প্রতি আন্তরিকভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাদের অবস্থা এমন ছিল তারা তাদেরকে (ওয়াহাবীদেরকে) খ্রিষ্টান, অগ্নিপুজক এবং হিন্দুদের থেকেও অধিক ঘৃণা করত। সারকথাঃ উল্লেখিত আচরণের কারণে তাদের (ওয়াহাবীদের) প্রতি

এত ঘৃণা। সে যেহেতু মুসলমানদেরকে এত কষ্ট দিয়েছে আবশ্যই এরূপ হওয়া প্রয়োজন। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা: ৫৪)

খারিজিদের জাহিরি দীনদারী ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষের জ্বলন্ত প্রমান নিম্নের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয়।

আল্লাম ইবনে আসীর (র.) তার 'উসদুল গাবাহ' কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পূর্ববর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন- হযরত সালেহ (আ.) এর উটনির পা কর্তনকারী। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি ঠিক বলেছ। পরবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কে? হযরত আলী (রা.) বললেন এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন পরবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তোমাকে এখানে আঘাত করবে। এই বলে তিনি মাথার দিকে ইশারা করলেন। (উসদুল গাবাহ)

ইবনে মুলজিম খারিজি যখন হযরত আলী (রা.)কে শহীদ করল, তখন তার কিসাস নেয়ার সময় সে যে আচরন করেছিল তা থেকে প্রমানিত হয় যে, খারিজিরা আল্লাহর যিকরের প্রতি অতি আগ্রহী। যখন তার হাত-পা কেটে ফেলা হল এবং চোখ উপড়ে ফেলা হল, তখন সে আনন্দচিত্তে কুরআন তিলাওয়াত করছিল। কিন্তু যখন তার জিহ্বা কাটার জন্য বের করা হল তখন সে যা বলেছিল তা 'উসদুল গাবাহ' কিতাবে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع فقيل له قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعت قال ما ذاك من جزع إلا أني أكره ان أكون في الدنيا فواقا لا أذكر الله

অনুবাদ: যখন তার জিহ্বা কাটার জন্য বের করা হল তখন সে কেঁপে উঠলো। তাকে বলা হল, হে আল্লাহর দুশমন! আমরা তোমার হাত-পা কেটে ফেললাম, চোখ উপড়ে ফেললাম; তুমি কেঁপে উঠোনি কিন্তু যখন তোমার জিহ্বা কর্তন করতে লাগলাম তখন কেন তুমি কেঁপে উঠলে? সে জবাবে বলল আমি দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহর যিকর থেকে অব্যাহতি নিতে অপছন্দ করি। (উসদুল গাবাহ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা; ৩৫)

কবরে বেহেশত-দূযখ দেখানো সম্ভব হলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখানো অসম্ভব হয় কিভাবে?

ইমাম বুখারী (র.) ইলমের ফযিলতের অধ্যায়ে হাত অথবা ইশারায় ফতোয়া দেওয়ার বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদে একটি র্দীঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, يقال ما علمك بهذا الرجل؟

অর্থ: (কবরে) প্রশ্ন করা হবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি জান? উক্ত প্রশ্নটি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হবে। আর প্রশ্নকারী হবেন মুনকার-নাকীর ফেরেশতা। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে উপস্থিত নন, তাই উক্ত হাদীসে নিকটবর্তী ইঙ্গিত বাচক শব্দ উল্লেখ করায় একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, যে প্রশ্নের উত্তরে হাদীসের র্নিভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল মুলহিমে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন, যার সার সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। মৃত ব্যক্তির অন্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থাকার কারণে এই শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

২। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মৃত ব্যক্তির মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবয়ব (সুরত মোবারক) দেখিয়ে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানতে হলে ফতহুল মুলহিম ২য় খণ্ড ৪৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।)

আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীগণ প্রথম মতটিকে (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তরে উপস্থিত থাকা) সর্মথন করলেও শেষোক্ত দুইটি মতকে তারা কবর পূজারীদের উক্তি বলে থাকেন। এধরনের অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদের অত্যন্ত আস্থাভাজন আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর ছাত্র উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী লিখিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরাআত কিতাবের ২য় খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রাসূলে পাক ও আউলিয়ায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কারো মর্যাদার কোন ব্যাপার হলে তা নির্দ্বিধায় লা-মাযহাবী ওয়াহাবীরা মেনে নেন। পক্ষান্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদার কোন ব্যাপার যত বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হউক তারা তা অস্বীকার করে থাকে। প্রমাণ স্বরূপ মুমিনের কবরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিত হওয়া অথবা পর্দা উঠিয়ে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করা ছাড়াও মুমিনের কবরে আরো অনেক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়। যেমন : কবরে মুমিনকে বেহেশত ও দোযখ দেখানো হয়। যা বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, বেহেশত সাত আসমানের উপরে, দোযখ সাত জমিনের নিচে অথচ তা কবরবাসীদেরকে দেখানো হয়। যদি লা-মাযহাবীদেরকে প্রশ্ন করা হয়, সাত আসমানের উপর বেহেশত, সাত জমিনের নিচে দোযখ থাকার পরও যদি আল্লাহ কবরবাসী মুমিন বান্দাহকে তা দেখাতে পারেন তাহলে মদিনা শরীফে রাওযা মোবারকের পর্দা উঠিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানো অসম্ভব হয় কিভাবে? আর এটা কবর পূজারীদের উক্তি হয় কিভাবে।

বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনূরী লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

আল্লামা আবু জামরা (জন্ম: ৩১৮) বাহজাতুন নুফুস, ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ما علمك بهذا الرجل؟

অর্থ: এই ব্যক্তি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি জান? ইহা দ্বারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা একই সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মানুষের মৃত্যু হয় এবং সবাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিকট থেকে দেখেন। এজন্যই হাদীস শরীফে هذا শব্দটি এসেছে যা কেবল নিকটবর্তী অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমনিভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই সময়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখা যায়। (আনওয়ারুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৮)

মোটকথা, আল্লাম সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করার পর লিখেছেন যেহেতু সকল হাদীসেই হাযার রাজুলু (এই ব্যক্তি) এসেছে সুতরাং ইহার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে কোন সহীহ অথবা দূর্বল হাদীস এর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত পাওয়া যায় না। সুতরাং কবরের অপরাপর অবস্থাগুলোর সহায়ক হিসেবে উক্ত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ নেয়া ভালো। (আনওয়ারুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৯)

যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে তা কারো কাছে চাওয়াই কি শিরক?

মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সহেব তাবলীগি নিসাবের অন্তর্ভূক্ত 'ফাযায়েলে হজ্জ' গ্রন্থে বর্ণিত যে ঘটনাগুলিকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করাকে সালাফিরা শিরক বলেছে তার জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন-

উল্লেখিত ব্যক্তিদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযায় গিয়ে এমন কোন কিছু চাওয়া, যা মানুষের কাছে চাওয়া যায়- তা চাওয়াতে শিরক হয়নি। তবে এমন কোন বিষয় যদি চাওয়া হতো, যা জীবিত মানুষের কাছে চাওয়া যায় না, সেসব বস্তু চাইলে তো শিরকি কথা হতো। অথচ এরকম কোন বস্তু উক্ত ঘটনাবলিতে চাওয়া হয় নি। যা জীবিত মানুষের কাছে চাওয়া জায়িয নয়। (ফাযায়েলে আমল ও উলামে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা:২৫৪)

ফরায়েজী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে যা চাওয়া যায় না তা মানুষের কাছে ওসিলা বা মাধ্যম মনে করে চাইলেও শিরক হবে। আমরা এ প্রসঙ্গে কুরআনে পাকের কয়েকটি আয়াত ও পর্যালোচনা তুলে ধরছি। এর দ্বারা লুৎফুর রহমানের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে:

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আ.) ও রানী বিলকিসের ঘটনা কুরআনে পাকের সুরা নমলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত ঘটনায় রয়েছে সুলাইমান (আ.) কিভাবে রানী বিলকিসের সিংহাসন সুদূর ইয়ামন থেকে সিরিয়ায় নিয়ে আসার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। নিম্নে আয়াতগুলি উল্লেখ করা হল-

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

অনুবাদ: ৩৮ সুলাইমান (আ.) বললেন, হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমপর্ণ করে আমার নিকট আসর পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে।

৩৯ এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বেই আমি উহা এনে দিব এবং এই ব্যপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।

৪০ কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হল- সুলাইমান (আ.) তার পরিষদবর্গের কাছে এমন একটি বিষয়ে সাহায্য চাইলেন, যে ব্যাপারে সতন্ত্রভাবে আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এখন বলূন সুলইমান (আ.) কি জানতেন না কোন ধরণের সাহায্য চাওয়া শিরক, আর কোনটি শিরক নয়? উত্তরে বলা যায় সুলাইমান (আ.) ভালোভাবে জানতেন সাহায্য প্রদানের মাধ্যম হিসাবে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া যায় অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের কাছে তা চাওয়া যায়। নতুবা তিনি এ ব্যপারে আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য চাইতেন। এ ধরণের চাওয়ার কারণে কি কেউ সুলাইমান (আ.)-এর উপর শিরকের ফতওয়া দিতে পারবেন? আর আল্লাহর ওলী আসিফ বরখিয়া উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার কারণে তার উপরও কি ফতওয়া দিতে পারবেন? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা কি সুলাইমান (আ.) এর যুগের আলিমদের চেয়ে কম? যে কারণে তাঁকে মাধ্যম বিশ্বাস করে আল্লাহর কাছে কোন কিছু তা চাইলে শিরক হবে। লুৎফুর রহমানদের জেনে রাখা উচিৎ এ ধরণের সমাধান দিয়ে সালাফীদের সন্তুষ্ট করতে পারবেন না।

স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় নবী কারীম (স.) এর পরিবর্তে আপন মুর্শিদের নাম জপে মহব্বত প্রকাশ করার প্রমান

মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজী তার লিখিত 'ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন' গ্রন্থে শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এক মুরীদের একটি ঘটনা উল্লেখ করে তার বিস্তারিত জবাব প্রদান করেছেন। সে যাই হোক, বক্তব্যটি পাঠ করলে শিরোনামে বর্ণিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমানিত হবে। বক্তব্যটি নিম্নে পেশ করা হল-
আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর ওপর কালিমা সম্পর্কিত অভিযোগ

অভিযোগ-১:

বেরেলবী তথা বেদআতী গ্রুপের পক্ষ থেকে এবং কথিত আহলে হাদীস গ্রুপের পক্ষ থেকে হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর উপর অভিযোগ করা হয় যে, হযরতের মুরীদ তাঁর নামের কালিমা ও দুরূদ পড়েছে, তখন হাকীমুল উম্মত লোকটিকে ধমক দেয়ার বদলে তাঁকে সুন্নাতের অনুসারী বলে মন্তব্য করেছেন। যে কারণে তিনি কাফির। নাউযুবিল্লাহ! তাই কয়েকটি অভিযোগ দাঁড়ায়। যথা:

১. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র.) নিজেকে নবী দাবী করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

২. যার ব্যাপারে ঘটনাটি ঘটেছে, তাকে ধমক প্রদান বা সতর্ক করা হয়নি, অথচ তাকে তা করা দরকার ছিল। তার বিবাহ পুনরায় দোহরানোও জরুরী ছিল।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত (র.) এমনটি করেনি, বরং তিনি কুফরীর ওপরই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর কুফরীর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা কুফরী। তাই হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র.) কাফির। নাউযুবিল্লাহ!

জবাব: প্রথমেই আমরা দেখে নেই আসলে উক্ত কিতাবে লোকটির বক্তব্যটি কিভাবে আছে। লোকটির বক্তব্য, 'একদা স্বপ্নে আমি কালিমা পড়ছিলাম। কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর স্থলে হযরতের নাম নিচ্ছিলাম। তখনই আমার মনে উদয় হয় যে, আমি ভুল করছি কালিমা পড়ার ক্ষেত্রে। সঠিকভাবে পড়া উচিত। এ খেয়ালে দ্বিতীয়বার কালিমা শরীফ পড়লাম। মনে তো এটা আছে যে, সঠিকভাবে পড়ব, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ থেকে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর স্থলে 'আশরাফ আলী' বেরিয়ে যায়। অথচ আমার একথা জানা আছে যে, এমনটি জায়িয নয়। কিন্তু অনিচ্ছায় মুখ থেকে এটাই বেরিয়ে যায়। দুই তিনবার এমনই হলো। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সামনে দেখতে পেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে আরও মানুষ ছিলেন। আমি এমনটি করতে ছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তখন আমার উপর কান্নার প্রবলতা এত বেড়ে গেল যে, আমি দাঁড়ানো থেকে পড়ে গেলাম। সাথে অত্যন্ত জোরে চিৎকার দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার ভেতর কোন শক্তি নেই। এমন অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। কিন্তু তখনো শরীরে ছিল অনুভূতিহীনতা। ছিল উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়াও। অথচ ঘুমন্ত ও জাগ্রত উভয় অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই খেয়াল ছিল। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর যখন কালিমা ভুল পড়ার কথা স্মরণ হলো, তখন মন থেকে এ ধাধণাটি দুর করার জন্য এবং কখনো যেন এমন ভুল না হয়, এ চিন্তায় বসে গেলাম। তারপর একপাশে কাৎ হয়ে কালিমা শরীফের ভুল পড়ার ক্ষতিপূরণার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু তারপরও মুখ থেকে বের হচ্ছিল- 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সায়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া মাওলানা আশরাফ আলী' অথচ আমি সজাগ। ঘুমন্ত নই। কিন্তু আমি

অনিচ্ছাকৃত ছিলাম। অপারগ ছিলাম। জিহবা নিজের আয়ত্বে ছিল না। সেদিন এভাবেই গেল। দ্বিতীয় দিন জেগেই ছিলাম। খুব কেঁদেছি। আরও অনেক কারণ আছে। যা হুযুর [আশরাফ আলী থানবী র.] এর সাথে মুহাব্বতের কারণ। কত আর বলব? [আল ইমদাদঃ ৩৫, মাহে সফর, ১৩৩৬ হিজরী] (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দঃ আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৪)

আপন পীরের সাথে ভালোবাসার এমন আরো অনেক প্রমাণ দেওবন্দি আকাবিরিনের কিতাবে বর্ণিত আছে। প্রমাণস্বরূপ শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেবের 'শরিয়ত ও ত্বরীকত কা তালাযুম' কিতাবে শায়খ মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের পীরের ধ্যান সর্ম্পকে লিখেছেন- হযরত গাঙ্গুহী (র.) বলেছেন, আমার পীর হযরত ইমদাদুল্লাহ সাহেবের চেহারা পূর্ণ তিন বৎসর আমার কলবে বিদ্যমান ছিল এবং তার কাছে জিজ্ঞেস না করে কোন কাজ করিনি। (শরিয়ত ও ত্বরীকত কা তালাযুম, পৃষ্ঠাঃ ১৮৮)

অনেক দেওবন্দি আলিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অপরাপর বুযুর্গদের মর্যাদার ব্যাপারটি অত্যন্ত হালকাভাবে দেখলেও তাদের পীর মাশায়িখদের মর্যাদাকে সীমাতিরিক্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। এ সম্পর্কে আমরা সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

তিনি লিখেন, 'সওয়ানিহে কাসিমী' এর অসতর্কতামূলক বক্তব্য- .... উদাহরনস্বরূপ 'সওয়ানিহে কাসিমী' ১ম খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় নানুতবী সাহেবের জীবনের আমলী দিককে ঈসা (আ.) এর জীবনের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠায় 'নানুতা' (নানুতবী সাহেবের জন্মস্থান) কে মদীনাতন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। নানুতবী সাহেবের জীবনের শেষ ১০ বছরকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাদানী জীবনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এবং তার কলবের বিশেষ অবস্থাকে ওহী নাযিল হওয়াকালীন বিশেষ অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (আনওয়ারুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮৬)

আপন মুর্শিদের সাথে রূহানী সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার পীর ও মুর্শিদ শায়খ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবরে বক্তব্য 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত কিতাব থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মুরীদকে ইয়াকিন বা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ কথা জানা উচিত যে, শায়েখের রূহ কোন এক স্থানে আবদ্ধ নয়; বরং মুরীদ যেখানেই থাকুন না কেন দূরে হোক বা কাছে- তিনি তার মুর্শিদের রূহের ফয়েয থেকে দূরে নন। যখন এ বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস রাখবে এবং সব সময় শায়খকে স্মরণ করবে তখন তাদের মধ্যে কলবের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে এবং সার্বক্ষনিক তার থেকে উপকৃত হতে থাকবে। কোন বিষয় উন্মোচনের জন্য যখন শায়খকে মুরীদের প্রয়োজন হবে তখন শায়খকে নিজের কলবের মধ্যে উপস্থিত করে রূহানীভাবে চাইবে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় শায়খের রূহ তা ঢেলে দেবে। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা: ৮০; ইমদাদুস সুলুক, পৃষ্ঠা: ১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণে কেবল রাওযা পাকের মাটি নয় বরং তার জন্ম, ওফাত ও মাতৃগর্ভে আগমনের সময়ও বরকতময় হয়েছে

মুফতি লুৎফুর রহমান ফরায়েজীর লিখিত 'ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন' গ্রন্থে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেবের উপর আরোপিত একটি প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে পেশ করা হলো।

আস্সালামু আলাইকুম।

তাবলীগ জামাতের 'ফাযায়েলে হজ্ব' এর নবম পরিচ্ছেদের 'রওজায়ে পাক জিয়ারতের আদব' অংশের ১৮ নং এ লেখা হয়েছে, যে জায়গা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর মুবারকের সহিত মিলিত আছে, উহা আল্লাহ পাকের আরশ হতেও শ্রেষ্ঠ, কা'বা হতেও শ্রেষ্ঠ, কুরছি হতেও শ্রেষ্ঠ। মাওলানা যাকারিয়া (র:) যে এ লেখা লিখেছেন তা কতটুকু সহীহ? কুরআন-হাদীসের দলিল সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আর এটা কি আকীদার কোনো বিষয়? হলে এক্ষেত্রে সহীহ আকীদা কী?

জবাব: শায়খ যাকারিয়া (র.) এর বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সহীহ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো মর্যাদাবান গোটা সৃষ্টিজগতে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই তিনি যেস্থানে মিলে আছেন তাও শ্রেষ্ঠস্থান। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কোনো স্থানের মুখাপেক্ষি নন, তাই তিনি কোনো স্থানের সাথে লাগোয়া নন। .... এ কারণেই আরশ কুরসীর চেয়েও রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে লাগোয়া জমি শ্রেষ্ঠ। (ফযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা: ২৪১)

লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করার পর যাকারিয়া সাহেবের বক্তব্যের সপক্ষে আরো ২৭ জন ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতামত পেশ করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে উক্ত কিতাবের ২৪৩ থেকে ২৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখে নিতে পারেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংস্পর্শের কারণে রাওজা শরীফের মাটিকে আরশ কুরসী থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করলেও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম, ওফাত ও মাতৃগর্ভের আগমনের সময়কে বরকতময় এবং স্মরনীয় মানতে অধিকাংশ দেওবন্দীরা নারাজ। অথচ বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

নবীগণের জন্ম ও ওফাত বরকতময় হওয়ার ব্যাপারে একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছি।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। এ দিনে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে (জান্নাত থেকে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে আর এ দিনেই তাঁর তাওবাহ কবুল করা হয়েছে এবং এ দিনে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী (র.) হাদীসে উল্লেখিত مات (ইন্তিকাল করেছেন) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

قال القاضي لا شك ان خلق ادم فيه يوجب له شرفا وكذا وفاته– فانه سبب لوصوله الي الجناب الاقدس.

অনুবাদ: নি:সন্দেহে জুমআ'র দিনে আদম (আ.) এর সৃষ্টি তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণ। তেমভিাবে তাঁর ইন্তিকালও (তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণ)। কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম। (মিরকাত, খণ্ড: ০৩, পৃষ্ঠা: ৪০৬)

উল্লেখ্য: কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের তারিখই বরকতময় হওয়ার মধ্যে সীমাদ্ধ নয় বরং তাঁর মাতৃগর্ভে আগমনের কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে জুম'আর রাত্রি শবে কদরের চেয়েও আরো ফযীলতপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে শায়খ মাওলানা আশারাফ আলী থানবী সাহেবের বেহেশতী জেওর কিতাবে জুম'আর রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস তুলে ধরছি-

হাদীস: মসনদে আহমদে আছে- জুম'আর রাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলত অপেক্ষা বেশি। কেননা এ রাতে হযরত সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগমন করেছেন। আর হযরতের শুভাগণের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (বেহেশতী জেওর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৯)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপাদমস্তক নূর বলা কি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী?

অনেক দেওবন্দী আলিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপাদমস্তক নূর বলা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কথা বলে থাকেন। অথচ তাদেরই শায়খুল হাদীস যাকারিয়া সাহেব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপাদমস্তক নূর বলেছেন। প্রমাণস্বরূপ তার লিখিত 'খাসাইলে নববী' কিতাবে বর্ণিত বক্তব্য পেশ করা হলো:

علما کی تحقیق یہ ہے کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن یا کپڑوں میں جوں نہیں ہوتی تھی اسکی وجہ ظاہر ہے کہ جوں بدن کے میل
سے پیدا ہوتی ہے اور پسینہ سے بڑھتی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سراسر نور تھے وہاں میل کچیل
کہاں تھا؟ اسی طرح آپ کا پسینہ سراسر گلاب تھا جو خوشبو [illegible] استعمال کیا جاتا تھا۔

অনুবাদ: উলামায়ে কিরামের তাহকাক হলো, হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীরে উকুন হতো না। কারণ, শরীরের ময়লা হতে উকুনের সৃষ্টি হয় এবং ঘামের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপাদমস্তক নূর ছিলেন। সেখানে ময়লা থাকার সুযোগ কোথায়? (শামাইলে তিরমিযী এর উর্দু ব্যাখ্যা গ্রন্থ খাসাইলে নববী, পৃষ্ঠা: ৩৫৪)

বিষয়টি আরো পরিস্কার করে বুঝার জন্য ইমাম মোল্লা আলী কারী (র:) এর 'জামউল ওয়াসাইল' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো-

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي بَيَانِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى صُورَةَ رَسُولِهِ الْأَعْظَمِ وَنَبِيِّهِ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ ; وَلِذَا قِيلَ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ اعْتِقَادُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي بَدَنِ آدَمِيٍّ مِنَ الْمَحَاسِنِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَحَاسِنِهِ الْبَاطِنَةِ مَا اجْتَمَعَ فِي بَدَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُ الصَّحَابَةِ النَّظَرَ إِلَيْهِ، انْتَهَى.
وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) ، وَقَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ: أَكْثَرُ النَّاسِ عَرَفُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَرَفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ حِجَابَ الْبَشَرِيَّةِ غَطَّتْ أَبْصَارَهُمْ،

অনুবাদ: .এই বাব হলো সে সকল হাদীস সর্ম্পকে যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তদীয় মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আকৃতি পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টির বর্ণনায় এসেছে। এজন্য বলা হয়, রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণতার অংশ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বদন মুবারকে বাতিনি সৌন্দর্যের প্রতি নির্দেশক যত জাহিরি সৌন্দর্য একত্রিত হয়েছে, তত সৌন্দর্য অন্য কোনো মানুষের শরীরে একত্রিত হয়নি। এ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়নি। যদি তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তার দিকে তাকাতে পারতেন না। আর কাফিরদের অবস্থা তো সেরূপ যেরূপ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: অর্থাৎ আপনি দেখবেন তারা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে অথচ তারা দেখছে না। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৯৮)। কোনো কোনো সুফী বলেন, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে চিনতে পেরেছে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারেনি। কেননা মানবীয় পর্দা তাদের দৃষ্টিশক্তিকে ঢেকে দিয়েছে। (মোল্লা আলী কারী (র.) কৃত জামউল ওসাইল ফী শরহিশ শামাইল, পৃষ্ঠা: ১০)।

মোল্লা আলী কারী (র.)-এর বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হলো।

১। ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শারিরীক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করার উপর।

২। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশ হলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে দেখতে পারতেন না।

৩। কাফিরগণ হেয় দৃষ্টিতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকানোর কারণে তাঁকে দেখতে পারেনি, যা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

৪। মানবীয় পর্দাবৃত থাকার কারণে অনেকেই আল্লাহকে পরিচয় করা সত্বেও তাঁকে পরিচয় করতে পারেনি।

বরকতময় রাতে মসজিদে সমবেত হয়ে ইবাদত বন্দেগী ও ওয়ায নসীহত করা কি বিদআত?

দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তাবলীগ জামাতের জুমআর রাত্রি মারকজে একত্রিত হয়ে পালন করার ব্যপারে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর পাঠ করলে বুঝা যায় তাবলীগিরা এটি একটি বিদআত প্রচলন করেছেন। প্রক্ষান্তরে দেওবন্দি উলামায়ে কিরামের মুখপাত্র ইউসুফ লুদিয়ানভী সাহেব তার লিখত 'আপকে মাসাঈল আওর ইনকা হল' কিতাবের অষ্টম খন্ডে এ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় এটা বিদআত নয় বরং উত্তম কাজ।

দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রশ্ন: নং- ১৫২৯৬২ (শব জুমআ করনা কেছা হায়?) জুমআর রাত্রি (মারকজে) পালন করা কেমন?

উত্তর: অনুবাদ: জুমাআর রাত্রি ইসলামে একটি মযার্দাপূর্ণ ও পবিত্র রাত। কিন্তু জুমআর রাত্রে মসজিদে একত্রিত হয়ে পালন করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী, তাবিঈ, ও তবেতাবিঈ থেকে প্রমাণিত নয়। ------------ প্রত্যেক জুমআর রাত্রিতে একত্রিত হয়ে পালন করার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ নয়। [দারুল ইফতা দারুল উলুম দেওবন্দ (ওয়েব সাইট)]

প্রক্ষান্তরে ইউসুফ লুদিয়ানবী সাহেব আপকে মাসাঈল কিতাবের ৮ নং খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রশ্ন ও উত্তর পাঠ করলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় তাবলীগ জামাতের মারকজে প্রতি জুমআর রাত্রে একত্রি হয়ে গুরুত্বের সাথে পালন করা বিদআত নয় বরং ভালো কাজ। নিম্নে আমরা লুদিয়ানবী সাহেবের কিতাবে বর্ণিত প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরছি।

تبلیغ والوں کا شب جمعہ کی پابندی کرنا کیسا ہے

س۔ سالوں سال تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آرہے ہیں۔ اور کبھی بھی ناغہ کرتے ہوے نہیں دیکھا گیا خدانخواستہ اسی عمل کی بنا پر تو اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ الخ۔ اور نیز اس پر دوام بدعت تو نہ ہوگا۔

ج۔ تعلیم و تبلیغ کے لئے کسی دن یا رات مخصوص کر لینا بدعت نہیں۔ نہ اس کا التزام بدعت ہے۔ دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر ہیں۔ جن کی پابندی التزام کیساتھ کی جاتی ہے، اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شبہ نہیں ہوا۔

অনুবাদঃ তাবলিগিদের (মরকযে) জুমআর রাত পালনের বিধান কি?

প্রশ্নঃ বছরের পর বছর ধরে তাবলিগিরা (মরকযে) জুমআর রাত পালন কর আসছে। কখনো এ কাজে বিরতি দিতে দেখা যায় না। আল্লাহ না করুন, এরকম আমল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী; 'তোমরা জুমআর রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করো না' এর আওতাভুক্ত হয়ে না যায়। আর কেবল এর উপর সব সময় আমল করা কি বিদআত হবে না?

উত্তরঃ শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন দিন কিংবা রাতকে নির্ধারণ করে নেয়া বিদ'আত নয়। এবং এটাকে আবশ্যকীয় করে নেয়াও বিদ'আত নয়। দীনি শিক্ষা প্রতিষ্টানসমূহে ভোরবেলাকে নির্ধারণ করে নেয়া হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে এটাকে মেনে নেয়া হয়। এতে কেউ কখনো বিদআতের সন্দেহ করেননি।

তাবলীগে মারকাযে জুমআর রাত্রে সবগোজারী সম্পর্কে দারুল উলুম দওবন্দের ওয়েব সাইটে আগত প্রশ্নের জবাব নিম্নে পেশ করা হল-

شب جمعہ اسلام میں عظیم ومقدس رات ہیں۔ لیکن شب جمعہ کومساجد میں جمع ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین وغیرہم سے ثابت نہیں ہے۔ شب قدر، رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں، عید الاضحیٰ کی رات اور شب برات وغیرہ کی طرح شب جمعہ میں بھی ہر شخص کو اپنے اپنے گھر میں انفرادی طور پر نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار اور دعاوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لئے مساجد میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار مسجد میں مستند ومعتبر عالم کا بیان ہو تو اس میں شرکت کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ اور ہر شب جمعہ میں اس کا اہتمام والتزام نہیں ہونا چاہئے۔ ویکره الاجتماع على احياء ليلة من الليالي المتقدم ذكرها وغيرها. لانه لم يفعله النبى ﷺ ولا اصحابه الخ (مراقی الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوی، ص۴۰۲: دار الکتب العلمیہ بیروت) وصرح بكراهة ذالك فى الحاوى القدى (رد المحتار، کتاب الصلاۃ۔ باب الوتر والنوافل، ص ۴۶۹، مکتبہ زکریا، دار الافتاء، دار العلوم دیوبند)

অনুবাদঃ ইসলামে জুমআর রাত একটি সম্মানিত ও পবিত্র রাত। কিন্তু জুমআর রাতে মসজিদে একত্রিত হওয়া, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনদের আমল থেকে প্রমাণিত নয়। শবে কদর, রমদ্বানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতসমূহ, ঈদুল আদ্বহা ও শবে বরাত ইত্যাদি রাতসমূহের ন্যায় জুমআর রাতে সকল লোকের নিজ নিজ ঘরে একাকী নফল ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ও দু'আর মধ্যে লিপ্ত থাকা উচিত। এজন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কখনো কখনো মসজিদে কোন নির্ভরযোগ্য আলিম

ওয়াজ নসীহত করেন, তবে তাতে শরীক হতে কোন অসুবিধা নেই। সকল জুম'আর রাতে এটাকে আবশ্যক করে নেয়া উচিত নয়।

উপরোল্লেখিত রাতসমূহ কিংবা অন্য কোন রাতে ইবাদতের জন্য একাত্রিত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা মাকরুহ। কারণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা সাহাবায়ে কিরাম এটা করেনি। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, প্রষ্ঠাঃ ৪০২, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)। হাওয়ী আল কুদসী কিতাবে এটাকে পরিস্কারর মাকরুহ বলা হয়েছে। (রদ্দুল মুহতার,কিতাবুস সালাত, বাবুল বিতর, পৃষ্ঠাঃ ৪৬৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া)

দারুল ইফতা

দারুল উলুম দেওবন্দ

এটা কি ফানা ফিল্লার অপব্যাখ্যা নয়?

অধিকাংশ দেওবন্দি সালাফি লা-মাযহাবী দ্বারা প্রভাবিত। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশী দেওবন্দিদের মুখপাত্র লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেবের একটি বক্তব্য থেকে। তিনি তার লিখিত বই 'ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ' কিতাবে (যে কিতাবটিতে অভিমত দিয়েছেন দেওবন্দী প্রখ্যাত আলিম আব্দুল মতিন সাহেব। বইটি প্রকাশিত হয়েছে আহলে হক মিডিয়া প্রকাশনা থেকে।) ফানা ফিল্লাহ সর্ম্পকে উলামায়ে দেওবন্দের উপর আরোপিত একটি আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন, ফানা ফিল্লাহ বিষয়ে উলামায়ে দেওবন্দের উপর অভিযোগের জবাব। ফানা ফিল্লাহর দলিল হিসাবে বুখারী শরীফের একটি হাদীস ও তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন তার ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করলে শিরকের কোনো গন্ধ থাকে না। অথচ এধরনের ব্যাখ্যা অধিকাংশ আকাবির ও সূফিগণের দৃষ্টিতে অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি আকাবিরিনে দেওবন্দের দৃষ্টিতেও এটা অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথমে আমরা লুৎফুর রহমান ফরায়েজী সাহেবের বই থেকে হাদীসটি এবং লুৎফুর রহমানের করা ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। বান্দা আমার নৈকট্য অর্জনের জন্যে ফরয আদায়ের চাইতে প্রিয় কোনো কাজ

করেনি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ, কান হাত ও পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে।

(যেহেতু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সকল কাজ কর্ম আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকাশ পায় এজন্যে একথা বলা হয়েছে যে, আমিই যেন তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কোন কিছু শুনে না, চোখ দ্বারা কোনো কিছু দেখে না, তাঁর বিধানের খেলাফ হাত পা চালায় না, বরং সবকিছু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং হুকুমের আওতায় থেকে করে, তখন আর তার চোখ, কান হাত ও পা নিজের রইল কোথায়? কার্যত আল্লাহ তাআলারই হয়ে গেছে)

যদি সে আমার কাছে চায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দেই, যদি আমার আশ্রয় কামনা করে, তাহলে আশ্রয় দান করি। আমি কোনো কাজ করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাঁর বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫০২)। (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা: ৩৮০)

উপরের বর্ণিত হাদিসটি আন্ডার লাইন করা মধ্যখানের অংশটি লুৎফুর রহমান ফরায়েজীর নিজস্ব ব্যাখ্যা। যা সালাফী, লা-মাযহাবীদের অনুসরণে করা হয়েছে। মুফতি লুৎফুর রহমান জাহিরিদের অনুসরনে করা ব্যাখ্যাকে সঠিক ব্যাখ্যা বলেছেন। অন্য ব্যাখ্যাকে ভন্ড সূফীদের ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন যা পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রমানিত হবে।

তিনি আরো কিছু অগ্রসর হয়ে লিখেছেন-

সতর্ক বার্তা: কথিত ভণ্ড সুন্নী নামধারী, মাজারপূজারী, কবরপূজারী, ভণ্ড সূফীরা উক্ত শব্দের শিরকী ব্যবহার করে থাকে। তাদের মতে 'ফানাফিল্লাহ' মানে হলো, আল্লাহর সত্তার মাঝে বান্দা বিলীন হয়ে যাওয়া। (নাউযুবিল্লাহ) (ফাযায়েলে আমল ও উলামায়ে দেওবন্দ: আপত্তি ও খণ্ডন, পৃষ্ঠা: ৩৮১)

দেওবন্দী আকাবিরীনদের কাছে যুগের ইমাম খ্যাত আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এই হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে প্রমাণিত হয়, লুৎফুর রহমান ফরায়েজীর বক্তব্য লা-মাযহাবী সালাফীদের অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রমান স্বরূপ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফয়জুল বারী

কিতাবে আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.)-এর যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো:

قلتُ: وهذا عدولٌ عن حقِّ الألفاظ، لأنَّ قولَه: «كنتُ سمعَه»، بصيغة المتكلِّم، يَدُلَّ على أنَّه لم يبقَ من المتقرِّب بالنوافل إلاَّ جسدُه وشبحُه، وصار المتصرِّفُ فيه الحضرةَ الإلهيةَ فحسب، وهو الذي عناه الصوفية بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن داوي نفسه، حتى لا يكونَ المتصرِّفُ فيه إلاَّ هو وهذا كما في القرآن العزيز في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: {فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَن بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ} (النمل: 8)، فالمرئي، والمَشَاهدُ لم يكن إلاَّ النارَ، دون الرب جلَّ مجده، ولكنَّ اللَّهَ سبحانه لمَّا تجلَّى فيها قال: {يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ} (القصص: 30). قال: فانظر فيه أنه كيف سَمِعَ صوتاً من النار {إنِّي أنا الله}، فهو نارٌ. ثم صَحَّ قولُه: {إنِّي أنا الله} أيضاً. فالمتكلِّمُ في المرئي كان هو الشجرة، ثم أسند تكلُّمَها إلى الله تعالى، وذلك لأنَّ الربَّ جلَّ مجدُه لمَّا تجلَّى فيها، صارت الواسطةُ لمعرفته إيَّاه هي الشجرةُ، فأخذ المتجلَّى فيه حكمَ المتجلِّي بنفسه قال:. وإنَّما تجلَّى ربُّه في النَّار لحاجة موسى عليه الصلاة والسلام إليها، ثم قال: فإن فَهِمْتَ معنى التجلِّي، كما هو حقُّه، وبلغت مَبْلَغَهُ، فدع الأمثالَ والصورَ المنصوبةَ، وارق إلى ربِّك حنيفاً. فإنَّه إذا صَحَّ للشجرة أن ينافي فيها: بإنِّي أَنَا اللَّهُ، فما بالُ المتقرِّب بالنوافل أن لا يكونَ اللَّهُ سمعَه وبصرَه. كيف وأن ابن آدم الذي خُلِقَ على صورة الرحمن ليس بأَدْوَن من شجرة موسى عليه الصلاة والسلام.

অনুবাদ: (আনওয়ার শাহ কাশমিরী বলেন) আমি বলি, এই অর্থ নেওয়া হাদীসের ভাষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং ভাষা থেকে বিচ্যুতি। হাদীসে 'মুতাকাল্লিম' (আমি) পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা জ্ঞাপন করে যে, যে ব্যক্তি নফল ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে নেয় শরীর ও আকৃতি ছাড়া তার কোন কিছু বাকী থাকে না এবং তার মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগকারী রাব্বুল আলামীনই হয়ে যান। এ স্তরটিকেই সূফীগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলে থাকেন অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট লোকটি কামবাসনার আওতার বাহিরে চলে যায় এবং তার মধ্যে কেবল আল্লাহর তাছাররুফ তথা ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ- কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে আছে যখন সে আগুনের কাছে পৌছল, তখন আগুনের ভিতর থেকে আওয়াজ এল 'মুবারক সেই সত্তা, যে আগুনের মধ্যে আছে।' কিন্তু সম্মুখে আগুনই ছিল অন্য কিছু নয়। যখন

আল্লাহ তায়ালার দ্যুতি অগ্নি থেকে প্রকাশ পেল তখন আওয়াজ এল 'আমি আল্লাহ।' অতএব চিন্তা করুন, হযরত মূসা (আ.) কিভাবে আগুন থেকে আল্লাহর কালাম শুনলেন। কালাম উচ্চারণকারী ছিল ব্যাহ্যতঃ বৃক্ষ। কিন্তু তার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে করে দেওয়া হল। কেননা আল্লাহর নূরের দ্যুতি বৃক্ষের মধ্যে ফুটে উঠলে সেই বৃক্ষ খোদায়ী মারিফতের মাধ্যম হয়ে গেল। অতএব বৃক্ষ আল্লাহর পর্যায়ে চলে এল। আল্লাহর দ্যুতি আগুনে প্রকাশ পেল কেন-এ প্রশ্নের জবাব এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর তখন আগুনের প্রয়োজন ছিল।

এরপর শাহ সাহেব বলেন: যদি আপনি দ্যুতি বিকীরণের সত্যিকার অর্থ বুঝে নিয়ে থাকেন তবে দৃষ্টান্ত ও আকারের উর্ধ্ব উঠে খোদায়ী নৈকট্য হাসিল করুন। কেননা, "আমি আল্লাহ" এই আওয়াজ যদি একটি বৃক্ষ থেকে আসা দুরস্ত হয় তবে রব্বুল আলামীন নৈকট্যশীল বান্দার কান, চক্ষু ইত্যাদি হয়ে যাবেন এটা দুরস্ত হবে না কেন? অথচ বান্দা রহমান তথা আল্লাহর আকৃতিতে স্থাপিত হয়েছে। অতএব তাকে মূসা (আঃ) এর বৃক্ষের চেয়ে কম মনে করা উচিত নয়। (ফয়যুল বারী)

যাহিরিদের অনুসরনে কেবল লুৎফর রহমান সাহেবের ব্যাখ্যাই যদি সঠিক হয়, আর মুহাক্কিক সূফীগণের অনুসরনে আনওয়ার শাহ কাশমিরি (র.) এর ব্যাখ্যা যদি ভুল এবং ভন্ড মাজার পুজারিদের হয় (নাউযুবিল্লাহ) তবে আমরা কার অনুসরন করব?

সাহাবায়ে কিরামের উক্তি কি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না?

আহলে হাদীস সালাফিগণ বলে থাকেন সাবায়ে কিরামের কথা ও কাজ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অথচ ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফের কিতাবুল গোসল অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। পরিচ্ছেদটির নাম হলোঃ মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা। উক্ত পরিচ্ছেদের অধিনে ইমাম বুখারী (র.) কোন মারফু (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থন) হাদীস উল্লেখ করেন নি। বরং শুধু আয়শা (রা.)-এর একটি বাণীর উপর নির্ভর করেছে। নিম্নে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হলোঃ

অনুবাদঃ খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া (র.) --- আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু'হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত। (বুখারী)

বুখারী (র.) আয়শা সিদ্দিকা (র.) এর উক্তির দ্বারা দলীল পেশ করার করাণে লা-মাযহাবীরা উক্ত অধ্যায়কে নির্থক বলবেন কি?

কদমবুছি

২২—عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَا عَمِّ اِرْضَ عَنِّي. رواه البخاری فی ادب الفرد والذهبی فی سیر اعلام النبلاء.

অনুবাদ: হযরত আব্বাস (রা.) এর দাস হযরত সুহাইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লহু আনহুকে দেখেছি হযরত আব্বাস (রা.) এর হাত ও দু'পায়ে চুমু খেতে। আর তিনি বলেছেন, 'হে চাচা! আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হোন।' (এ হদীস ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদ এবং যহবী (র.) সিয়ারু ইলামিন নুবালা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

২৩—عَنْ زَارِعٍ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ وَرِجْلَيْهِ. رواه ابو داود والبخاری فی الادب المفرد.

অনুবাদ: হযরত যারি' রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-যখন আমরা মদীনায় আগমণ করলাম তখন দ্রুততার সাথে আমাদের বাহন থেকে নামলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ও পা মুবারকে চুমু খেলাম। (আবূ দাউদ, ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন।)

দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের কাছে মুফতিয়ে আ'জম বলে স্বীকৃত মুফতি শফী সাহেব উলামা মাশয়িখদের হাত-পা চুম্বনের ব্যাপারে আবিদ সিনদী (মৃত্যু: ১২২৪ জিরী) এর একটি পুস্তিকার সার সংক্ষেপ 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত কিতাবে তিনি (আবিদ সিন্দী) উলামা মাশয়িখদের হাত-পা চুম্বনের চুম্বনের স্বপক্ষে ১৯টি দলীল প্রদান করেছেন এবং শেষে মন্তব্য করেছেন এভাবে- 'উপরোক্ত সকল ঘটনা ও বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে, উলামা মাশায়িখ ও ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিদের হাত, পা ও কপালে চুমো খাওয়া সুন্নাত

এবং কোন প্রকার বিরোধ ছাড়াই সাহাবা তাবিঈনদের আমল দ্বারা সাব্যস্ত। (জাওয়াহিরুল ফিকহ, পৃষ্ঠা: ১৯৩)

রঈসুত তাবলীগ ইউসূফ কান্দুলভী সাহেবের বক্তব্য:

তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা ও ইলিয়াছ ছাহেবের ছাহেবজাদা এবং তার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত মাওলানা ইউসুফ কান্দুলভী তাবলীগিদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান যে কিতাবটি লিখেছেন তার নাম হল- 'হায়াতুস সাহাবা'। উক্ত কিতাবের ৩য় খণ্ড 'মুসাফাহা ও মুআনাকা' অধ্যায়ে মুসলমানদের হাত-পা চুম্বন করা সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (র.) এর 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাব থেকে দু'টি হাদীসও উল্লেখ করেছেন যে দু'টি হাদীসে পদচুম্বনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের বক্তব্য:

শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার লিখিত 'আততাকাশশুফ আলা মুহিম্মাতিত তাসাউফ' কিতাবে বুযুর্গগণের হাত পা চুম্বন করা সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করে এর ফায়দা অংশে লিখেছেন- 'এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মুহিব্বীনদের হাত, পা ও কপালে চুমু খাওয়ার যে প্রথা রয়েছে তাতে কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, শরীয়তের সীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (মাসাঈলে তাসাউফ, হাদীস নং ২৩৬, পৃষ্ঠা ২৮৮)

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

বর্তমান দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের শায়খুল ইসলাম মুফতি তকী উসমানী সাহেব তার লিখিত দরসে তিরমিযী কিতাবে কোন মসজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ অনুচ্ছেদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের বৈধতা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করার পর আউলিয়ায়ে কেরামের যিয়ারত প্রসঙ্গে লিখেছেন।

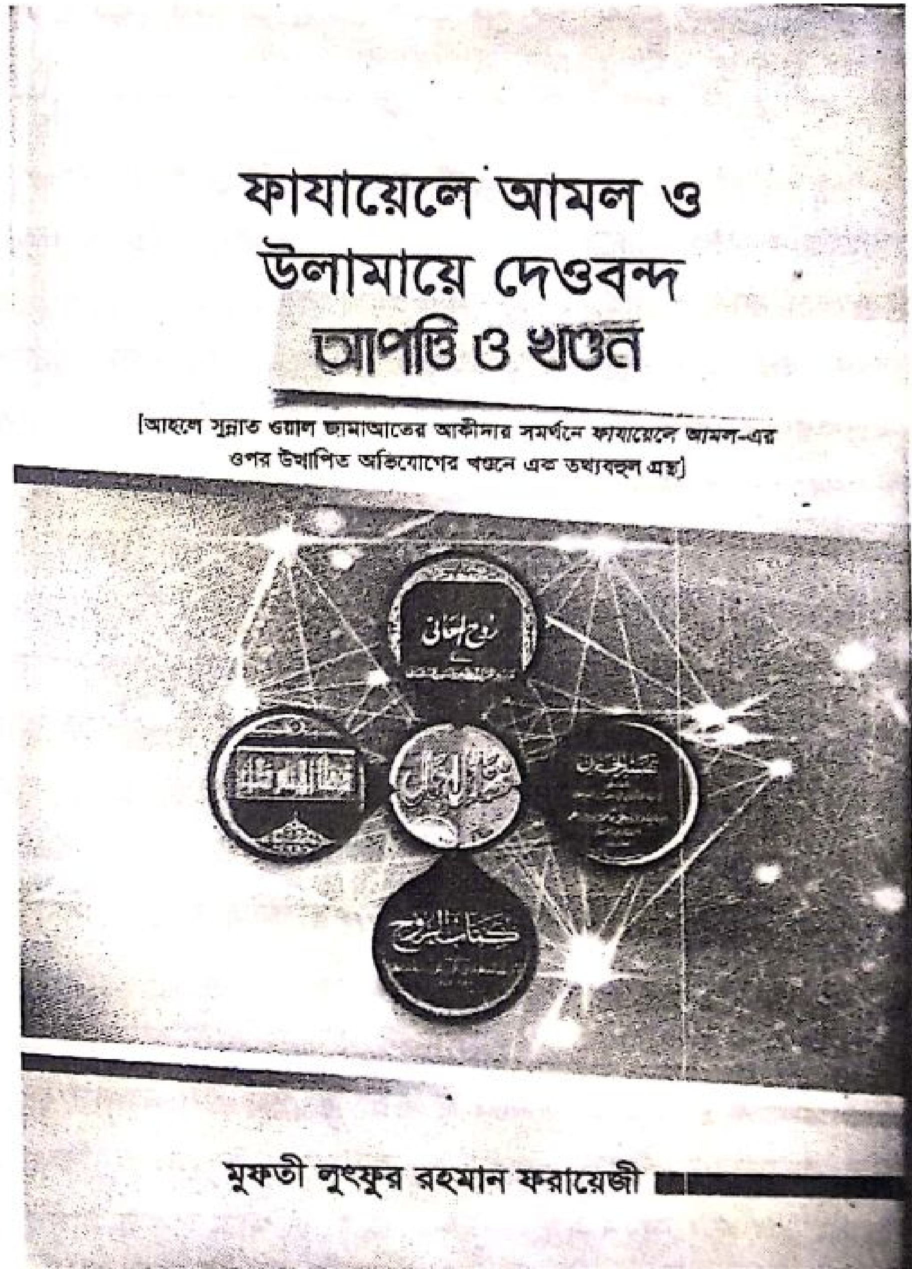
আহকারের (তকি উসমানী) আবেদন, আল্লামা শামী (র.) এর উপর মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন-

হাদীসের অনুবাদ: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুহাদায়ে উহুদের কবরে প্রতি বছরের শুরু বা শেষে উপস্থিত হতেন।

এটি বর্ণনা করার পর আল্লামা শামী (র.) লিখেন 'এর দ্বারা বোঝা গেল যিয়ারত করা মুস্তাহাব। যদিও যিয়ারতগাহ দূরবর্তী হোক না কেন।' ফাতাওয়া শামী ঃ ১/২০৪ যেহেতু নিষেধের কোন প্রমাণ নেই, সেহেতু মৌলিক বৈধতার

আবেদনও এটাই যে, এতে কোন অসুবিধা নেই। আর কবরের উপর বিভিন্ন প্রকার বিদআত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণরূপে কবর যিয়ারত বাদ দেয়া সমীচীন নয়। বরং এসব মন্দ কাজগুলো থেকে বাঁচা ও বাঁচানোর সম্ভাব্য সব রকমের ফিকির করা উচিত। আল্লামা ইবন হাজার মক্কী (র.) ও এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আল্লামা শামী (র.) ও এর সমর্থন করেছেন। (দরছে তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা: ১৬৭-৬৮)

যেহেতু আমরা মুফতি লুৎফুর রহমান ফারায়েজী এর বই থেকে অনেক উদ্বৃতি পেশ করেছি, এ কারণে তার বই এর কভার পেজ এর স্কেন কপি প্রদান করা হল। আগ্রহী পাঠকগণ মূল বই দেখে নিতে পারেন।



কুরআন হাদীসের ভাষায় কথা বলার নামে বে'আদবির স্বরূপ

কুরআনে পাকে নবী রাসূল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কিছু উক্তি রয়েছে যা আমাদের পক্ষ থেকে নবী রাসূল সম্পর্কে বলা বে'আদবি। আহলে হাদীস সালাফি ও কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম ওয়াজ নসীহতের মধ্যে এসব উক্তিকে কুরআনের ভাষায় কথা বলার দুহাই দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বলে থাকেন। এরকম বলা সুস্পষ্ট বে'আদবি। প্রমান স্বরূপ বিশ্ব বিখ্যাত দুইটি তাফসির গ্রন্থ থেকে এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো-

لا يجوز لا حد نا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه في اثناء قوله تعالي عنه, او قول نبيه, فاما ان يبتدي ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في ابائنا الادنين الينا, المماثلين لنا, فكيف في ابينا الاقدم الاعظم الاكرم النبي المقدم, الذي عذره الله سبحانه و تعالي وتاب عليه و غفر له-

অনুবাদঃ আমাদের মধ্যে কারো জন্য আদম (আ:) এর প্রতি এ (অবাধ্যতা) শব্দ ব্যবহার করা জায়িয নেই । তবে কুরআনে পাকের এ আয়াত কিংবা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন বাণীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মধ্যখানে এ ধরনের শব্দ যদি এসে যায় তবে তা বর্ণনা করা যাবে: কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে পূর্বপুরুষদের জন্যও এ শব্দ প্রয়োগ জায়িয নেই। তাহলে আমাদের আদি পিতা যিনি সব দিক থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে অগ্রগামী ও সম্মানিত, যার উযরকে আল্লাহ পাক গ্রহণ করে তাওবাহ কবুল করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন তাঁর ব্যাপারে এসব শব্দ প্রয়োগ করা কিভাবে জায়িয হবে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে তাফসীরে কুরতুবী ও বাহরে মুহিত-এর হাওলায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৬ষ্ট খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, সুরা ত্বাহা, আয়াত নং ১২১)

এ প্রসঙ্গে ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র:) এর আল হাওয়ী কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

কাযিউল কুযাত শায়খুল ইসলাম শিহাবুদ্দিন ইবনে হাজারকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বতে লোকেরা যে মিলাদের আয়োজন করে থাকে এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কী অভিমত? এমনকি কোন কোন নারী, পুরুষ, আম ও খাস সকল মানুষ উপস্থিত

রয়েছে এমন মিলাদ মাহফিলে এমন কিছু অবতারণা করে থাকেন যেগুলোর মাধ্যমে পূর্ণ তাযিম রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এমনকি এর মাধ্যমে শ্রোতারা চিন্তিত ও আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। তখন তারা দয়াদ্র হয়ে যান সম্মান করেন না। এর একটি উদাহরন হলো, **ধাত্রীগন উপস্থিত হলো, কিন্তু তারা সম্পদ না থাকার কারনে তাকে গ্রহন করলো না। কিন্তু হালিমা তাকে দয়াপরবশ হয়ে গ্রহন করল। তারা বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাগল চরাতেন। তারা এ কবিতা ও আবৃতি করে-**

ছাগল নিয়ে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **চারন ভূমিতে গেলেন**। তিনি কতই না উত্তম রাখাল, আমার অন্তরে যার স্থান।

আরেকটি উদাহরন এমন যে, কতই না উত্তম ছাগলগুলো তিনি চরান। এ ধরনের অনেক কথা রয়েছে যেগুলোতে যথাযথভাবে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা হয় না । এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত।

শায়খ ইবনে হাজার আসকালানীর উত্তর নিম্নরূপ:- বিচক্ষনের জন্য উচিত হলো, যার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হবে তার ত্রুটি প্রকাশিত হয় এমন সংবাদ প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে কোনো ক্ষতি নেই; বরং এটি ওয়াজিব।

আল্লামা সুহাইলী রাওদুল উনুফ গ্রন্থে 'আমার বাবা ও তোমার বাবা জাহান্নামী' এ হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন একথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাতা-পিতার শানে আমাদের বলা সমীচীন নয়। আর এটা এজন্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদের কষ্ট দিও না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।

অতীতকালে ছাগল চরানো ত্রুটিপূর্ন কোনো বিষয় ছিল না, কিন্তু বর্তমানে ইহা সম্পুর্ন বিপরীত। আর এ বিষয়টি অস্বীকারও করা যায় না। এমন পেশা রয়েছে যেটি এককালে অবমাননাকর; অন্য কালে নয়। এক শহরে অবমাননাকর; অন্য শহরে নয়। বিবাহের সমতার ক্ষেত্রে এবং সাক্ষীর ব্যাক্তিত্বের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য এটিকে সমর্থন করে। এমনকি 'মিনহাজ' কিতাবে এ মাসাআলা বর্ণিত আছে। আর ঝগড়াটে ব্যক্তি গালি ও অবমাননার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করে থাকে। এমনকি সে বলে থাকে "হে

ছাগলের রাখাল! তোমার জন্য এটি একটি সাধারণ বাক্য। আর এ ধরনের স্থানে নবীগনের অবস্থার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না, বিশেষ করে সাধারন মানুষের মাঝে। (আল হাওয়ী লিল ফাতওয়া, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪১; তানযীহুল আমবিয়াহ আন তাসফিয়াতিল আগইয়াহ, ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী)

আকাবিরীনে দেওবন্দের দৃষ্টিতে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ)

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দেও শীর্ষস্থানীয় উলামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, কাসিম নানুতবী, আশরাফ আলী থানবী ও শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেব প্রমুখের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় উলাময়ে কিরামের কি পরিমাণ উচ্চ ধারণা ছিল তা দেওবন্দীদের নিকট ইমামে রব্বানী বলে স্বীকৃত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের 'ইমদাদুল সুলুক' কিতাবের শুরুতে যে উপাধিসমূহ ব্যবহার করেছেন, তা থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়-

بنام نامي واسم سامي و افتخار المشائخ الاعلام مركز الخواص والعوام منبع البركات القدسية مظهر الفيوضيات المرضية معدن معارف الالهية مخزن الجقائق مجمع الدقائق سراج اقرانه قدوة اهل زمانه سلطان العارفين ملك التاركين غوق الكاملين غياق الطالبين الذي قلت السنة الاقلام عن مدائحه البالغة و اعجزت التوصيف شمائله الكرام الساطعة يغبط الاولون والاخرون من شعاره و يحسده الفاجرون والغافلون من دثاره مرشدي معتمدي وسيلة يومي وغدي مولاي و معتقي سيدي سندي الشيخ الحاج المشهور بامداد الله الفاروقي التهانوي سلمه تعالي بالارشاد والهداية وازال بذاته المطهرة الضلالة والغواية–

অনুবাদঃ বিখ্যাত ও সমুন্নত নাম, জগতের বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের গর্ব, বিশিষ্ট ও সাধারণের কেন্দ্রবিন্দু, সমুন্নত বরকত ও কল্যাণের উৎস, অঢেল নিয়ামতরাজির প্রকাশস্থল, ঐশী আধ্যাত্মিকতার খনি, হকিকতের ভাণ্ডার, সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়সমূহের মিলনস্থল, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণের প্রদীপ, তাঁর যুগের অধিকারীদের অনুসরণীয়, আরিফীনদের বাদশাহ, দুনিয়াবিমুখদের বাদশাহ, কামিল ও অন্বেষণকারীদের সাহায্যকারী, যার প্রশংসা করতে গিয়ে কলমের ভাষা যৎসামান্য, যার সমুন্নত চরিত্রের বর্ণনা দিতে কোন গুনই যথেষ্ট নয়, যার

অভ্যন্তরীণ অবস্থায় পূর্বাপর সকলেই ঈর্ষান্বিত, যার বাহ্যিক অবস্থা দর্শনে পাপী ও গাফিল তাকে হিংসা করছে, আমার মুর্শিদ, আমার ভরসা, আমার আজ ও আগামীকালের ওয়াসিলা, আমার মাওলা, আমাকে মুক্তকারী, আমার সর্দার, আমার সনদ শাইখ মাওলানা আলহাজ্জ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী আল-ফারুকী থানবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহ তাকে পথপ্রদর্শন ও হেদায়াতের মাধ্যমে নিরাপদ রাখুন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার মাধ্যমে গোমরাহী ও অন্ধকার দূর করে দিন।"

শায়খ হুসাইন আহমদ মদনী সাহেব (১৮৭৯-১৯৫৭খ্রি.) তার 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব ও তার অনুসারীদের উত্তর দিতে গিয়ে এ উপাধিগুলো উল্লেখ করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন-

'সুধীগন! এই ইবারতগুলোর শব্দ ও অর্থগুলোর দিকে খেয়াল কর এবং ইনসাফের দৃষ্টিতে বল, ওয়াহাবীরা এধরনের শব্দ ও এমন আকীদা বিশ্বাস কারো ক্ষেত্রে পোষণ করে কি? বর্ণিত ইবারতের দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুতবুল আলম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী কুদ্দিসা সিররুহুল আযিয এর সকল রচনা ও আকীদা বিশ্বাসে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহমতুল্লাহি আলাইহি একমত পোষণ করতেন এবং এর অনুসারী ছিলেন।' (শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা-৭৯)

বুযুর্গানে কিরামের জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনা বরকতময় হলে রাসূল (সা.)-এর মিলাদের আলোচনা বরকতময় নয় কী?

শেখ মাওলানা বদরে আলম মিরাটি (১৩১৬-১৩৮৫ হিজরী) তরজমানুস সুন্নাহ নামে উর্দু ভাষায় একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির ৪র্থ খণ্ডের শুরুতে তার ছাহেবজাদা মাওলানা আফতাব আহমদ সাহেব তাঁর পিতার জীবনী লিখেছেন। এক পর্যায়ে মিরাটি সাহেবের জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন- তার আব্বার জন্মের সময় ইংরেজ লেডি ডাক্তার আনা হয়েছিল। ডাক্তার এসে বলল, অপারেশনের প্রয়োজন। অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার পর একজন মুসলমান ধাত্রী আসলেন, তখনি স্বাভাবিকভাবে তার জন্ম হয়ে গেল। এভাবে জন্ম হওয়ার কারণ তিনি লিখেছেন:

گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ انگریز کافر کے ہاتھ میں ایسا جسم مبارک جو اتنی صفات کا مالک ہونے والا تھا
دے دیا جائے چنانچہ ان کا ایک مسلمان عورت کے ذریعے سے دنیا میں آنا مقدر ہوا' یہ ایک کھلی کرامت ہے۔

অনুবাদঃ সম্ভবত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এমন ছিল না যে, একজন ইংরেজ কাফিরের হাতে তার পবিত্র দেহ দুনিয়াতে আসুক যিনি ভবিষ্যতে অসংখ্য গুণের অধিকারী হবেন। সুতরাং একজন মুসলমান মহিলার সাথে দুনিয়ায় আসা তার তকদিরী ছিল। এটা একটি প্রকাশ্য কারামত। (তরজমানুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬)

'হেকায়াতে সাহাবা' কিতাবে বর্ণিত একটি ঘটনাঃ

শায়খুল হদীস যাকারিয়া সাহেব 'হেকায়াতে সাহাবা' (তাবলিগি নেসাব) কিতাবের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইমাম হাসান (রা.) এর শৈশবকালীন জ্ঞানচর্চা পচ্ছিেদের ফায়দা অংশে উলে- খ করেন-

"আমি আমার পিতার নিকট অনেকবার শুনেছি এবং ঘরের বৃদ্ধা মেয়েলোকদের নিকট থেকেও শুনেছি যে, বাবাজান যখন দুধ ছেড়েছিলেন, তখন এক চতুর্থাংশ পারা কুরআন তার মুখস্থ হয়ে যায় এবং ঐ বয়সে দাদাজানের নিকট থেকে তিনি বুস্তা, সিকান্দার নামা ইত্যাদি ফারসি কিতাবও পড়ে ফেলেন।" (তাবলীগী নেসাব, পৃষ্ঠাঃ ৬৩৪)

মহিলাদের কবর যিয়ারত

বুখারী শরীফে 'কবর যিয়ারত' অধ্যায়ে বর্ণিত একটি হাদীস ও তার ব্যাখ্যা দ্বারা মহিলাদের কবর যিয়ারতের বৈধতা প্রমানিত হয়। নিম্নে হাদীসটি উল্লেখ হল-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

অনুবাদঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচিছলেন, যিনি কবরের পাশে কাদঁছিলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার পাশ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মসিবত আসেনি। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় হাজির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই। (বুখারী, বাব: কবর যিয়ারত)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে হজর আসকালানী (র:) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' কবর যিয়ারতের বৈধ্যতা ও উপকার সর্ম্পকে আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকীম ইত্যাদি কিতাবের বরাতে হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন-

اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة كذا اطلقوا وفيه نظر لأن بن أبي شيبة وغيره روى عن بن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم– ومقابل هذا قول بن حزم أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به واختلف في النساء فقيل دخلن في عموم يأمر وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة

উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত হল কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। .... যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন তাদের ব্যাপারে বলা যাবে উপরোল্লিখিত হাদীস তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। হাফিয ইবনে হজম বলেছেন, জীবনে একবার কবর যিয়ারত করা কেবল মুস্তাহাব নয় বরং ওয়াজিব। কেননা হাদীস শরীফে নির্দেশ সূচক শব্দ এসেছে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামদের মতে ফিতনার না থাকলে জায়িয। বুখারী শরীফের উপরোল্লিখিত হাদীস জায়িয হওয়ার দলিল। কেননা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহিলাকে (হাদীসে বর্ণিত) কবরের পাশে বসতে নিষেধ করেন নাই বরং কবরের পাশে কান্নাকাটি ও অধৈর্য হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজটিকে অপছন্দ করেননি তা জায়িয হওয়ার পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। (ফতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:১১৮)

যারা মহিলাদের কবর যিয়ারতকে নি:শর্তভাবে না জায়িয বলে থাকেন তারা তিরমিযী শরীফের হাদীস لعن زوارات القبور (অর্থ: অধিক যিয়ারতকারীদের উপর অভিশম্পাত) হাদীসটি দিয়ে দলিল পেশ করে থাকেন। অথচ ইমাম তিরমিযী (রা:) এই হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন, আবু ঈসা (র:) বলেছেন এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কোন কোন আলিম এ মত পোষণ করেছেন যে, এটা ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পূর্বেকার হুকুম। যখন তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তখন তাঁর অনুমতিতে নারী-পুরুষ সকলই এ অনুমতির অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেছেন মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত মাকরূহ বলা হয়েছে শুধু এই কারনে যে, তাদের ধৈর্য কম এবং বেশী অস্থির হয়ে পড়ে। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:২০৩)

ইমাম তিরমিযী (র:) এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি যিয়ারতের বৈধতার হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। অথবা মহিলাদের ধৈর্য কম হওয়ার কারণে অস্থির হয়ে পড়ার ভয় থাকলে কোন কোন আলিম নিষেধ করেছেন। আর তা না হলে জায়িয।

ইমাম ইবনে হজর আসকালানী (র:) লিখেছেন, ইমাম কুরতুবী বলেন-

قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه لك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك لا مانع من يأمر لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء–

হাদীসে অভিশম্পাতের কথা আসার কারণে যারা মাকরূহ বলেছেন তারা ঐ সমস্ত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যারা অধিক পরিমানে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বার বার কবরে যায়। কেননা زوارات (অধিক যিয়ারতকারীনী) আধিক্য বাচক বিশেষণ। তার আরও একটি কারণ হতে পারে, স্বামীর অধিকার ক্ষুন্ন হওয়া অথবা পর্দার ক্রটি এবং কবরের পাশে গিয়ে কান্নাকাটি ও অস্থিরতা। কারণ মহিলারা দুর্বল চিত্ত হয়ে থাকেন। এ ধরণের কোন আশংকা না থাকলে কবর যিয়ারত জায়িয হতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ কবর যিয়রতের অনেক উপকার রয়েছে। যেমন, মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ। আর এ ধরণের উপকারের ব্যাপারে পুরুষ মহিলা সকলেই মুখাপেক্ষি। (ফতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৮)

কেউ কেউ বলে থাকেন, মহিলাদের যিয়ারতের ব্যাপারে হানাফিদের দুইটি মত আছে। এক: জায়িয অপরটি নাজায়িয। এ উক্তিটি সঠিক নয়। প্রমান স্বরূপ আকাবিরীনে দেওবন্দের ইমামুল আসর (যুগের ইমাম) আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র:) এর বক্তব্যের সংকলন 'আনওয়ারুল বারী' থেকে তার বক্তব্য তুলে ধরছি।

এফাদায়ে আনওয়ার (আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর বক্তব্য): আল্লামা শামি আমাদের ইমাম সাহেব (আবু হানিফা) থেকে দুইটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। এক: কেবল পুরুষের জন্য জায়িয, দুই: পুরুষ-মহিলা সবার জন্য জায়িয। আমি (শাহ সাহেব) দুইটি উক্তিকে একত্রিত করতে চাই। কারণ আমার মতে ইমাম সাহেব (র:) থেকে দুইটি উক্তি বর্ণিত নয়। প্রকৃত পক্ষে বর্ণনা একটি, যার দুইটি দিক রয়েছে। অর্থাৎ অবস্থার পরির্বতনে হুকুম বদলে গেছে। যদি মহিলা সবরগোজার হন, কবরে গিয়ে হাহুতাশ এবং শরীয়তের সীমা অতিক্রম না করার সম্ভাবনা না থাকে তবে ঘর থেকে বেরিয়ে কবর যিয়ারতে যেতে পারবেন; অন্যথায় নয়। (আনোয়ারুল বারী, ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৯)

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী (র:) 'আত-তালখীসুল হাবীরে' মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের বৈধতার উপর মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আয়শা (রা:) এর হাদীস দ্বারা প্রমান পেশ করেছেন। হযরত আয়শা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলআল্লাহ। আমি তাতে কিরূপ বলব? (অথাত, যখন মহিলারা কবর যিয়ারত করে)। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি বল- السلام علي اهل الديار من المئومنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون (সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৪)

হাফিয (র:) বৈধতার আরেকটি প্রমাণ মুসতাদরাকে হাকিম সূত্রে উল্লেখ করেছেন- হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত যে, নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফতিমা (রা:) তাঁর চাচা হামযা (রা.) এর কবর শুক্রবারে যিয়ারত করতেন। সেখানে তিনি দু'আ করতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। (আত-তালখীস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়িয হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হল- 'আত-তামহীদ' কিতাবে উল্লেখিতআব্দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (র:) এর রেওয়ায়াত। সেটি হল হযরত আয়েশা (রা:) একদিন কবরস্থান থেকে এগিয়ে এলেন। আমি তাকে বললাম, উম্মুল মু'মিনীন! আপনি কোথায় থেকে এলেন?

উত্তরে তিনি বললেন, আমার ভাই আব্দুর রহমানের কবর থেকে। আমি তাকে বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতেন, অত:পর যিয়ারত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (উমদাতুল ক়ারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮৯)

শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব ও তার লিখিত 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাব

মাদানী সাহেব উক্ত কিতাবটি আহমদ রেযা খান বেরলভী সাহেবের অভিযোগের জবাবে লিখেছেন। যার প্রমান দেওবন্দি উলামায়ে কিরামের অসংখ্য কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে। বর্তমানে কিছু সংখ্যক দেওবন্দি সালাফি ওয়াহাবিদের দালালি করার উদ্যেশ্যে মনযুর নুমানি সাহেবের লিখিত একটি কিতাব ছাপিয়ে ব্যাপকভাবে বিলি বন্টন করছেন। তাদের উদ্যেশ্য হচ্ছে মাদানী সাহেব 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে ওয়াহাবিদের বিপক্ষে যা লিখেছেন তা তিনি প্রত্যাহার করেছেন, এ কথা প্রমান করা। প্রকৃতপক্ষে মনযুর নুমানি, সৈয়দ আবুল হাসান আ়লী নদভী প্রমূখ আলিমগণ সালাফি ওয়াহাবিগণের ইমাম হাফিয ইবনে তাইমিয়্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। যার প্রমান দেওবন্দি প্রখ্যাত আলিমগণের কিতাবসমূহে উল্লেখিত রয়েছে। প্রমানস্বরূপ আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর বক্তব্যের সংকলন সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী এর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যখ্যা গ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' কিতাব থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

واضح ہو کہ علامہ ابن تیمیہؒ نے سترہ مسائل میں چاروں اماموں کی مخالفت کی ہے اور انتالیس مسائل میں جمہور و اجماع امت کا خلاف کیا ہے۔ لہٰذا تاریخ دعوت و عزیمت ص ۲/۱۱۲ میں یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ مسائل جن میں علامہ ابن تیمیہ نے مجموعی طور پر ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا ہے، دو دو چار سے زیادہ نہیں۔

অনুবাদ: প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ ১৭টি মাসলায় চার ইমামের বিরোধিতা করেছেন। ৩৯টি মাসআলায় ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত মত প্রদান করেছেন। সুতরাং সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত 'দাওয়াত ও আযীমত' ২য় খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠায় যে দাবী করেছেন হাফিয ইবনে তাইমিয়্যাহ সর্বসাকুল্যে দু' চারটি মাসআলায় চার ইমামের সাথে ভিন্নমত পোষন করেছেন- এ কথা সঠিক নয়। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২৬০)

সন্দেহের
নিরসন-১

মোঃ গিয়াস উদ্দীন